সচিত্র শিশু-উপন্যাস

শ্রীপরেশচন্দ্র বসু প্রণীত

গোলাপ পাব্লিশিং হাউস
১২, হরীতকী বাগান লেন,
কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীঅনিলচন্দ্র বসু
কিশোর গ্রন্থালয়
২০, ঈশ্বর মিল লেন,
কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন—১৩৪৩

মূল্য—এক টাকা

মুদ্রাকর—
শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়
গোলাপ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১২, হরীতকী বাগান লেন,
কলিকাতা।
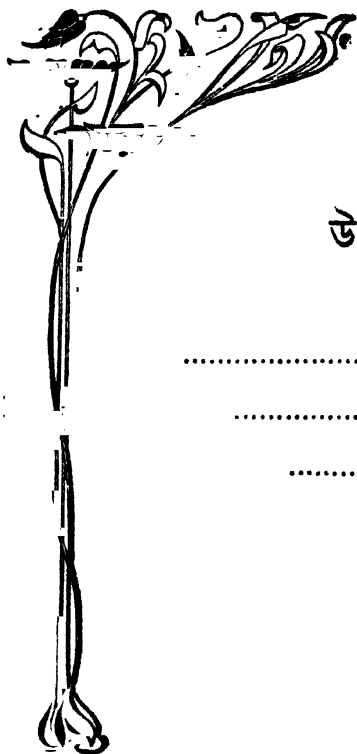
উপহার

সমীরের প্রথম আঘাতে তার চোখের কাছ থেকে চোয়াল
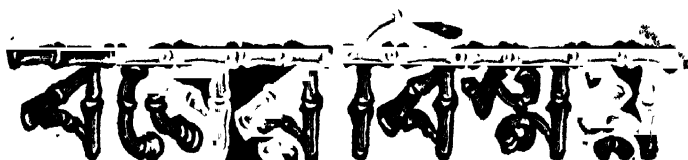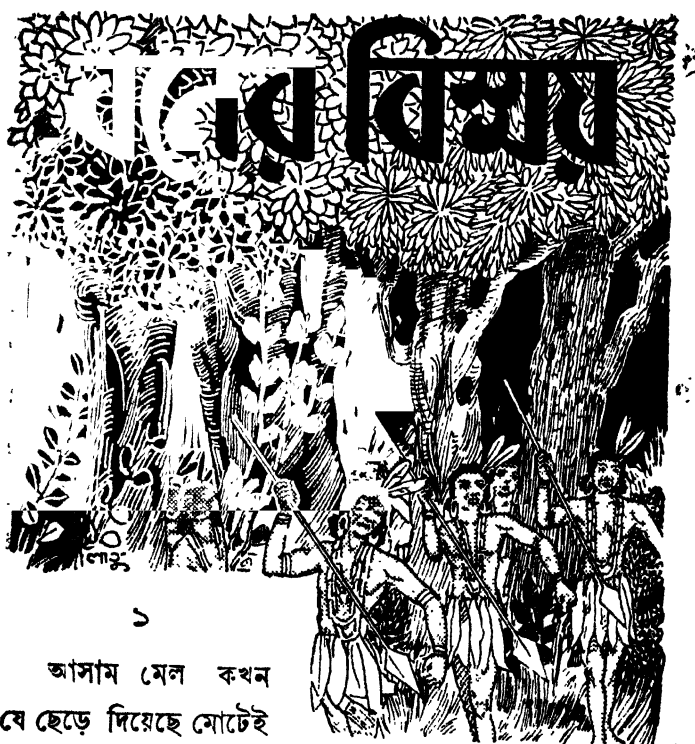
১

আসাম মেল কখন যে ছেড়ে দিয়েছে মোটেই টের পাইনি।...এই আমার প্রথম বাড়ী ছেড়ে বেরুনো। একটা অজানা আনন্দ ও ভয় এতক্ষণ আমার মনটা ছেয়ে ছিল। আমি যেন কোন্ মায়ারাজ্যে ঘুরছিলুম—এই কঠিন পৃথিবীর সমস্ত সম্পর্ক ভুলে গিয়ে।

বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি, অবিশ্রান্ত শব্দ করতে করতে ট্রেণ ছুটে চলেছে। দু'ধারে উন্মুক্ত মাঠ; দৃষ্টির সীমারেখায় অনন্ত নীল আকাশ এসে তার সঙ্গে মিশেছে। এ সব আমার

কাছে নতুন নয়, কিন্তু তবুও আজ যেন তারা নতুনভাবে আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল।

দু'পাশে ধানের ক্ষেত। বাতাস তাদের উপর ঢেউ তুল্‌তে তুল্‌তে কোথায়—কোন্ সুদূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। ক্ষেতগুলোর একান্তে পাতার কুঁড়ে কতকগুলো—পরিষ্কার, ঝরঝরে, তক্‌তকে। বোধ হয় এই সব ক্ষেতের চাষীদের।
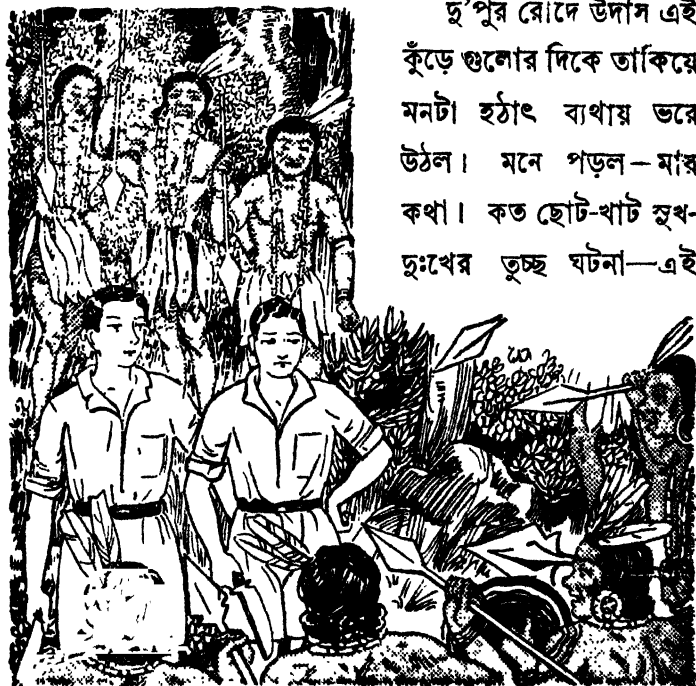
দু'পুর রোদে উদাস এই কুঁড়ে গুলোর দিকে তাকিয়ে মনটা হঠাৎ ব্যথায় ভরে উঠল। মনে পড়ল—মার কথা। কত ছোট-খাট সুখ-দুঃখের তুচ্ছ ঘটনা—এই

বিদায়-বেলায় মনকে বারে বারে দোলা দিয়ে যাচ্ছে! চোখে এল জল ভরে।

সমীর কাছে এসে বল্‌লে, কিরে তপন, মার জন্যে মন কেমন করছে বুঝি?

সমীর আমারই সমবয়সী। একটু সুবিধা পেলেই সে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। মায়ের কাছে অনেক কাকুতি-মিনতি করে এবার তার সঙ্গে চলেছি আসামে মণিপুর রাজ্যে—সমীরের এক আত্মীয়ের বাড়ী।

তার কথা শুনে চোখের জলটা কোন রকমে রোধ করলুম। লজ্জিত হয়ে গাড়ীর চারধারে একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখি, আমাদের সহযাত্রী কেবল একটী প্রৌঢ় ভদ্রলোক।

মনের এই কোমল বৃত্তি নিয়ে ঠাট্টা করতে সমীরের উপর খুবই চটে গেলুম। একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বল্‌লুম, যদি করেই, তাহলে জগতে কোন লোক তাকে অন্যায় বলবে না; আর না করার বাহাদুরীও আমি তোর মত কিনতে চাই না।

আমার কথা শুনে শুধু সমীর নয়, সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি পর্য্যন্ত হো হো করে হেসে উঠলেন—হয়ত অকারণে আমাকে রাগতে দেখে।

হাসি থাম্‌লে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি বল্‌লেন, আপনাদের কথার মধ্যে আমার হাসা যদি অন্যায় হয়ে থাকে, তবে মাপ্

করবেন। সত্যি তপনবাবু, বাড়ীর জন্যে মন কেমন করাকে জগতে কেউ অন্যায় বলতে পারে না, কিন্তু মজা এই—মনে জানলেও মুখে কেউ এ সত্যটা মান্‌তে চায় না।

লোকটির কথা শুনে মনের রাগটুকু কেটে গেল।

ভদ্রলোকটির সঙ্গে পরিচয় হতে দেরী হ'ল না। বয়সে তিনি আমাদের থেকে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে থাকলেও মনটাকে ঠিক আমাদের মতই রেখেছেন। আসামের বন ইজারা নিয়েছেন তিনি। উপস্থিত চলেছেন সেখানে। নাম রাজেন্দ্রনাথ চৌধুরী। লোকটিকে বড্ড ভালো লাগ্‌ল। বল্‌লুম, রাজেনবাবু, আপনার সেখানে থাক্‌তে বেশ ভালো লাগে নিশ্চয় ?

মুখখানাকে গম্ভীর করে রাজেনবাবু বল্‌লেন, খুব। এমন কি সেখান থেকে ফিরতে ইচ্ছে করে না। আর ফিরতেও বোধ হয় হবে না। বনের বাঘ, ভালুক, হাতী, গণ্ডারের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম—বুনো লোকগুলোও তাদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এদের সকলকে চিরদিন সন্তুষ্ট রাখতে পারব বলে ত আমার ভরসা হয় না।

রাজেনবাবুর কথা শুনে আমরা দু'জনেই হেসে উঠলুম। বল্‌লুম, আপনি যথেষ্ট বাড়িয়ে বল্‌ছেন, রাজেনবাবু। আপনি যাই বলুন, আমার ত মনে হচ্ছে, বনে থেকে থেকে আপনি

রাগ হিংসেগুলোকে বিদায় করে মুনি-ঋষিদের মত শান্ত-সরল হয়ে পড়েছেন।

আমার কথা শুনে রাজেনবাবুর চোখ দু'টো একবার চক্‌চক করে উঠল। মিষ্টি হেসে বল্‌লেন, আপনারা চলেছেন কোথায়? বাড়ী?

সমীর বললে, না, মণিপুরে এক আত্মীয়ের কাছে বেড়াতে যাচ্ছি।

আমি তাড়াতাড়ি বল্‌লুম, চল্‌না সমীর, যাবার পথে আমরা দু'দিন রাজেনবাবুর কাছে থেকে যাই। সত্যি, বাঘ-ভালুক ভরা সত্যকারের বন আমার দেখতে এত ইচ্ছে করে...

রাজেনবাবু বল্‌লেন, বল্‌তে আমি ভরসা পাচ্ছিলুম না; সত্যি যাবেন আপনারা?

সমীরের দেখলুম, যেতে আপত্তি নেই। বরাবর দেখে আসছি, ছোট, বড় যে কোন বিপদের সম্ভাবনাই থাক্‌না কেন, তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে সমীরের এতটুকু ভয় করে না। সুতরাং ঠিক হ'ল, লামডিং-এ নেমে রাজেনবাবুর সঙ্গে যাওয়া হবে। সেখানে দু'চারদিন কাটিয়ে তারপর মণিপুরে পাড়ি দোব।

লামডিং-এ যখন পৌঁছলুম, সূর্য্য তখন সমস্ত আকাশটায় আবীর ঢেলে দিয়ে ধীরে ধীরে অস্ত যাচ্ছে। চারদিক নিস্তব্ধ;

মনটা একটা অজানা পুলকে দুলে দুলে উঠতে লাগল। রাজেনবাবুর মোটর অপেক্ষা করছিল—তিনজনে গিয়ে তাতে চড়ে বসলুম। লোকালয় ছেড়ে মোটর ধীরে ধীরে অরণ্যরাজ্যে প্রবেশ করলে।

গাড়ীর পেছনের সীটে আমরা দু'জন—সামনে রাজেনবাবু আর ড্রাইভার। বনের মধ্যে অন্ধকার; কোনদিকে কিছু দেখা যায় না—মোটরের হেড্ লাইটে আলোকিত সামনের সামান্য একটু বনপথ ছাড়া। অমন যে জোরালো আলো, জমাট অন্ধকারের কাছে তাও যেন মিট্‌মিটে তেলের প্রদীপের মত দেখাচ্ছে।

গাড়ীতে বসে বসে কেমন একটা মিষ্টি অথচ কড়া গন্ধ নাকে আসছিল। মনে যথেষ্ট আনন্দ পেলেও শরীরে কেমন একটা শিথিল ভাব। চোখ যেন ঘুমে জড়িয়ে আসে।

বললুম, সমীর, একটা মিষ্টি গন্ধ আসছে—কিসের বল্‌ত?

সমীরের কিন্তু কোন সাড়াই পেলুম না। ঠেল্‌তেই দেখি, কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

হঠাৎ মনটা কেমন ভয়ে কেঁপে উঠল; কিন্তু তখন মনটাই শুধু সজাগ—সামান্য হাত নাড়বার ক্ষমতাটুকু পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলেছি।

একটা কিছু করবার জন্যে—অন্ততঃ আমাদের অবস্থাটা রাজেনবাবুকে জানাবার জন্যে মনটা হাঁকপাঁক করতে লাগল।

ক্রমে কেমন নিঃশ্বাসের কষ্ট...তারপর যে কি হ'ল মনে পড়ে না...

২

চোখ মেলে চাইতেই দেখি, সমীর আমার মুখের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। ঘুমের পরে শরীরটা বেশ হাল্‌কা বোধ হ'ল। মনেও কেমন একটা আনন্দের ভাব। বল্‌লুম, আমরা পৌঁছে গেছি, না রে সমীর? গাড়ীতে কি ঘুমই যে পেয়েছিল! তুই ত আমার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিলি?

ভারী গলায় সমীর বল্‌লে, হ্যাঁ।

সমীরের গম্ভীর স্বর কাণে যেতেই চম্‌কে উঠে বসলুম। তার মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখি, বাদল দিনের মেঘলা আকাশের মত থম্‌থম্ করছে। সমীরের এরকম মূর্ত্তি ত কখনও দেখিনি! ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল। তার হাত দু'খানা চেপে ধরে বল্‌লুম, কি হয়েছে, ভাই?

কিন্তু তাকে আর কিছু বল্‌তে হ'ল না। এতক্ষণ কোথায়

যে আছি, তা দেখিনি। এখন দেখি, ছেঁচা বেড়ার ঘরে একটা বাঁশের মাচার উপর শুয়ে আছি। না আছে বিছানা, না বালিশ। আমার মাচা থেকে একটু তফাতে আর একটা মাচা; সমীর বোধ হয় ওইখানেই শুয়েছিল।

ঘরের মেঝেটা স্যাঁৎসেঁতে। একটা ভ্যাপসা গন্ধ কেমন যেন চারধারে গুলোচ্ছে। ঘরের দরজা বন্ধ। বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে আলো এসে জানিয়ে দিচ্ছে, এখন দিন। বল্‌লুম, দরজাটা খোল্ সমীর, চল্, বাইরে যাই।

শান্তস্বরে সমীর বল্‌লে, দরজা কি আমি বন্ধ করেছি, যে খুল্‌ব ?

তবে ?

তবের কথা আমি কি জানি।—সমীর বল্‌লে। আমার ত বেশ মনে আছে, এ ঘরে আমি জ্ঞাতসারে ঢুকিনি। তারপর একটু থেমে সমীর আমার দিকে চেয়ে বল্‌লে, তবে তুই যদি বন্ধ করে থাকিস্।

সমীরের কথার উত্তরে তাড়াতাড়ি বল্‌লুম, আমি যে কখন এখানে এসেছি তা মোটেই টের পাইনি, ভাই !

আমার কথা শুনে সমীর চিন্তিত মনে বসে রইল।

তার অবস্থা দেখে বললুম, কি হ'ল সমীর ?

হতাশভাবে সমীর বল্‌লে, তা হ'লে আমরা এখানে বন্দী !

বন্দী!—সমীরের কথাটা কাণে যেতেই মনে হ'ল, কে যেন কতকটা গলানো সীসে ঢেলে দিলে। মাথাটা গেল ঘুরে।

কতক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে যেন হারাণ ভাষা ফিরে পেলুম। বল্লুম, তুই হয়ত ভুল বুঝছিস্, সমীর। আমাদের বন্দী করে রাজেনবাবুর লাভ?

গম্ভীর হয়ে সমীর বল্লে, ভুলই বুঝেছি বটে! এই রকম ঘর আর এমন শয্যা! এসব দেখে, আমার বোঝা উচিত ছিল যে, তোকে জামাই করবার জন্যে নিয়ে এসেছে। নিশ্চয়ই লাভ কিছু আছে বই কি! নইলে কথায় ভুলিয়ে অজ্ঞান করে এখানে নিয়ে আসবার...

সমীরকে আর বল্‌তে দিলুম না। বাধা দিয়ে বল্লুম, তোর আজ কি হয়েছে বল্ ত? নিজের মনগড়া কতকগুলো কথা নিয়ে মিছিমিছি এক ভদ্রলোককে দোষ দিচ্ছিস্? ব্যাপারটাই আগে ভাল করে জান্।

জান্‌তে আর আমার কিছু বাকী নেই বন্ধু, শুধু গোড়াতেই কেন এ সন্দেহ করিনি, এ কথা ভেবে গালে চড়াতে ইচ্ছে করছে। কাল যে মিষ্টি ফুলের গন্ধের কথা বল্‌ছিলি, সেটা সত্যিই ফুল। তবে ওর আর একটা গুণ যে, বেশীক্ষণ শুঁক্‌লে জ্ঞান হারাতে হয়।

সমীরের কথা শুনে মনে হ'ল, আমি যেন কতকাল ধরে

এই ঘরে বন্দী। এ পৃথিবীর সঙ্গে আমার সমস্ত দেনা-পাওনা চুকে গেছে—আমি মৃত। বল্লুম, এখন উপায় সমীর?

সমীর বল্লে, এখন কোন উপায় দেখছি না তপন। তবে মাথা ঠাণ্ডা রেখে আমাদের চল্‌তে হবে। তুই ভয় পাসনি, বন্দী সমীর চিরকাল এখানে প্রাণ গেলেও থাক্‌বে না।

বাইরে হঠাৎ তালা খোলার শব্দ হতেই সমীর থেমে গেল।

দরজার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলুম—মনে আশা ও আনন্দ নিয়ে। মনে মনে সমীরকে মিথ্যে ভয় দেখাবার জন্যে গালাগালিও দিতে লাগলুম।

যা ভেবেছিলুম তাই। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুক্‌লেন, রাজেন বাবু—সঙ্গে একটা লোক। বেঁটে, মোটা চেহারা; দেখলে মনে হয়, অসীম শক্তি ওর দেহে। চোখ দু'টো শয়তানি মাখা, মায়া দয়া ত দূরের কথা, মানুষ খুন করতেও ওর বোধ হয় একটুও বাধে না।

রাজেনবাবুকে দেখে যে আনন্দ মনে জেগেছিল, সঙ্গীটির দিকে তাকিয়ে নিমিষে তা উবে গেল। তবু সাহস করে বল্লুম, রাজেনবাবু…

হঠাৎ হো হো করে বিকট হাসির শব্দে আমার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে রাজেনবাবুর দিকে তাকিয়ে রইলুম।

রাজেনবাবুর সেই মিষ্টি হাসি—সেই অমায়িক ব্যবহার যেন যাদুমন্ত্র-বলে লোপ পেয়ে গেছে। এক রাত্রির মধ্যে মানুষকে এমন বদ্‌লাতে চোখে দেখা ত' দূরের কথা, কেউ বোধ হয় ভাবতেও পারে না।

হাসি থামিয়ে রাজেনবাবু বল্‌লেন, ট্রেণের কথা বল্‌ছ ত? সে সব মিথ্যে—সে কথা ভুলে যাও। কাজ গুছোবার জন্যে ও রকম অনেক কিছুই বানিয়ে বল্‌তে হয়। তোমরা আরো বড় হ'লে এ কথা বুঝতে পারবে—আর এটাও জেনে রাখো, কাউকেই সহজে বিশ্বাস করতে নেই।

সমীর এতক্ষণ চুপ করে বসে রাগে ফুল্‌ছিল। বোধ হয় আর থাকতে না পেরে গর্জ্জে উঠল, কিন্তু কি অপরাধ আমরা আপনার···

তাকে বাধা দিয়ে ঠাট্টার সুরে রাজেনবাবু বল্‌লেন, আহা, আমি কি একবারও মুখের ফাঁক দিয়ে বলেছি যে, তোমরা আমার কোন অনিষ্ট করেছ? বরং লক্ষ্মীছেলের মত আমার ফাঁদে যে সুড় সুড় করে পা বাড়িয়ে দিয়েছ, তার জন্যে তোমাদের ধন্যবাদ দি। দেখ, মানুষের প্রয়োজনটা সকলের উপরে, আমারও মুঠোর মধ্যে তোমাদের পাওয়া বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছিল।

অনুনয়-বিনয় মিথ্যে বুঝে বল্‌লুম, কি কাজের জন্যে আমাদের এখানে নিয়ে এসেছেন, জান্‌তে পারি?

আহা! অত ব্যস্ত কেন? সময়ে সব জান্‌তে পারবে। এখন একবার ঘুরে-ঘারে বনটা দেখে নাও। তারপর লোকটার দিকে তাকিয়ে রাজেনবাবু বল্‌লেন, শঙ্কর, এদের যা কিছু দরকার দেখিস, আর প্রত্যেক কথায় আমাকে বিরক্ত করতে যাস নি। দরকার বুঝলে, নীরদবাবুকে বলিস্‌।

একটা কঠোর দৃষ্টি হেনে রাজেনবাবু চলে গেলেন।

পাথরের মত আমরা সেখানে বসে রইলুম।

রাজেন বাবু বিদায় নিলে শঙ্কর বল্‌লে, এখন তোমরা বাইরে যেতে পার। আমি তোমাদের খাবার-দাবারের যোগাড় করে রাখছি।

এ মায়ের শাসন নয় যে, অভিমান করে বসে থাকলে অজস্র আদরে মা রাগ ভাঙ্গাবেন। এরা কি উদ্দেশ্যে এখানে এনেছে তার কিছুই জানি না—জানি না কিরকম শাস্তি এদের অবাধ্যতার। কাজেই অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালুম।

জঙ্গলের খানিকটা সাফ্‌ করিয়ে চৌকো করে এইরকম কুঁড়ে তৈরী করা হয়েছে—প্রায় পঞ্চাশ ষাটখানা। মাঝখানটা উঠান। উঠানের মাঝখানে দুটো ইঁদারা। নানা বয়সের নানা জাতের লোক দেখি, ঘর থেকে বেরিয়ে কুড়ুল হাতে চলেছে—বনের দিকে। বোধ হয়, ঐ আকাশের সমান উঁচু শাল আর শিশু গাছগুলোর মাথা মাটির সঙ্গে লুটিয়ে দিতে। খালি

হাতেও কতকগুলো লোক চলেছে—এরা বোধ হয় সর্দ্দার। শেষ লোকটি যতক্ষণ না চোখের আড়াল হ'ল, ততক্ষণ রইলুম তাদের দিকে চেয়ে, কিন্তু আমাদের সমবয়সী তারা একজনও নয়।

অজানিতে বুক থেকে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। চম্‌কে উঠলুম। কেন এ দুর্ব্বলতা? সুখকে যেমন হাসিমুখে বরণ করে নিতে পারি, সে রকম আদর করে ডেকে নিতে কেন পারি না দুঃখকে? পৃথিবীর সকল জাতির যুবকদল শুনি, মূর্ত্তিমান্ বিদ্রোহ। সুখ-শয্যা হেলায় ত্যাগ করে তারা বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেদের ইচ্ছায়, আর সেই বিপদের দুঃখ-কষ্ট কাটিয়েও তারা বেরিয়ে আসতে পারে; আমরা ভাগ্য দোষে যে বিপদের মধ্যে পড়েছি—মুক্তি তার হাত থেকে না পাই, অন্ততঃ তার দেওয়া দুঃখ কষ্টটুকুও কি সহ্য করতে পারব না? বীর না হতে পারি, কাপুরুষতার দুর্নাম কিন্‌ব কেমন করে? মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম, আজ থেকে সুখ ও দুঃখ এক বলে বরণ করে নিলুম। কোন কিছুই আর আমাকে টলাতে পারবে না।

মনে একটু বল পেলুম। কিছুক্ষণ ঘোরার পর আর ভাল লাগল না। ক'টা যে বেজেছে ঠিক বুঝতে পারছি না—বাড়ী থেকে বেরুবার সময়, ঘড়ি একটা সঙ্গে ছিল বটে, কিন্তু এখানে এসে সেটা আর দেখতে পাচ্ছিনা—আর পাচ্ছিনা সঙ্গের টাকা

কড়িগুলোর সন্ধান। বন্দী দশার ভারই বইতে পারব না ভেবে, বোধ হয়, দয়াময়েরা ঐ ভারগুলো কমিয়ে দিয়েছেন।

মানুষ যেখানে কোন বাধা সৃষ্টি করেনি, প্রকৃতির স্বাধীনতা যেখানে উদার, সেখানে মানুষের তৈরী ঘণ্টা মিনিটের হিসাব পাব কোথা থেকে ?

চারদিকে চড়্‌চড়ে রোদ। আকাশে সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল, বেলা এগারোটা হতে পারে।

ভাগ্য পরিবর্ত্তনে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে—তার গুরুত্ব যেন এতক্ষণে একটু একটু বোধ করতে পাচ্ছি। উদ্দেশ্যহীন ভাবে আর ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগছে না, এখন নির্জ্জনে বসে একবার ভাবতে ইচ্ছে করছে।

সমীরের দিকে ফিরে তাকালুম, তার মুখেও চিন্তার কালো ছায়া। বললুম, সমীর, চল্ ফিরি।

সমীর বল্‌লে, আয়। তার কথার মধ্যে বেসুরো কিছু কাণে ঠেক্‌ল না ; যেন সে নিজের বাড়ীতেই আছে—এমনি ভয় লেশহীন।

ঘরে ঢুকে দেখি,—শঙ্কর খাবার ব্যবস্থাই করে রেখেছে বটে ! ঘরের সামনে যে দাওয়া—সেখানে একটা চুলি কাটা।

পাশে কতকগুলো শুক্‌নো ডাল-পালা। ঘরের মধ্যে একটা হাঁড়ি—চাল, ডাল, নুন, তেল আর কতকগুলো আনাজ। বুঝলুম, স্বপাক আহার। কোলের কাছে বাড়া ভাত খাবার দিন ফুরিয়েছে।

আমাদের দেখে শঙ্কর একগাল হেসে বল্‌লে, দেখ্‌লে গো সব ঘুরে ফিরে? কেমন লাগল?

নিলর্জ্জের মত তাকে হাসতে দেখে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে উঠল। তার কথার জবাব না দিয়ে বল্‌লুম, আমাদের নিজের হাতে রেঁধে খেতে হবে, কেমন শঙ্কর?

আমার রাগ বোধ হয় শঙ্করের সজাগ চক্ষু এড়ায় নি। দাঁতে দাঁত চেপে রাঙা চোখে সে একবার আমাদের দিকে তাকালে—শুধু একবারই। তারপর সহজ সুরে জবাব দিলে, হাঁ, ঐ কলসীতে জল আছে। আর যদি দরকার হয় ইঁদারা থেকে তুলে নিও।

আর একটুও অপেক্ষা না করে শঙ্কর ঘর ছেড়ে চলে গেল।

'ক্ষুন্নিবৃত্তি' ছাড়া খাওয়ার আর অন্য অর্থ এখন আমাদের কাছে ছিল না। দু'জনের মিলিত চেষ্টায় সে কাজটা কোন রকমে শেষ হ'ল।

খাওয়া-দাওয়া সেরে দু'জনে এসে বাঁশের মাচায় আশ্রয় নিলুম, কিন্তু শুতে পারলুম না।

শঙ্কর চলে যাওয়ার পর থেকে আর জন-প্রাণীর দেখা পাইনি—তবু মন বল্‌ছিল, কাছেই কেউ না কেউ আছে—আমাদের প্রত্যেকটি কথা কাণ পেতে শুন্‌তে।

মনে মনে একটা ফন্দি এঁটে বল্‌লুম, চল্‌ সমীর, কিছু শুক্‌নো পাতা এনে এর ওপর পুরু করে পাতি—বিছানার মত।

সমীর সায় দিয়ে উঠে পড়ল।

বনের মধ্যে একটু এগিয়ে গিয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখছি—কো্ দিক্ দিয়ে পালানো যায়।—হঠাৎ চেয়ে দেখি, একটা লোক আমাদের দিকে এগিয়ে আস্‌ছে। লোকটা কি ভূঁই ফুঁড়ে উঠল? হয়ত নিজের নিজের চিন্তায় বিভোর ছিলুম বলে, ওর আসা আগে আমাদের চোখে পড়ে নি।

লোকটা কাছে এসে বল্‌লে, এই যে, আপনারা বেড়াতে বেরিয়েছেন—বেশ, বেশ!

সমীর তাকে বাধা দিয়ে বল্‌লে, বেড়াতে আসিনি, এসেছি কিছু শুক্‌নো পাতা কুড়োতে—মাচার উপর পাতবো বলে।

লোকটার ঠোঁটের কোণে একটা বাঁকা হাসির রেখা খেলে গেল; বল্‌লে, ও! তা ওই সঙ্গে কিছু শুক্‌নো কাঠও নিয়ে যাবেন—এখানে সকলেই নিজের নিজের কাজ করে।

লোকটা আর দাঁড়াল না। ইচ্ছে হ'ল, ছুটে গিয়ে একটা ঘুসিতে ওর মুখটা ভেঙ্গে দিয়ে আসি।

২

৩

আজ তিনদিন হ'ল, আমরা নাম-না-জানা এই দেশে এসেছি। গুণ্‌তিতে তিন দিন হ'লেও অন্য কোন জায়গায় আর কোনদিন বাস করেছি বলে মনে হয় না।

প্রথম দিনের সেই পাতা কুড়োতে যাবার ছল করে পথ খুঁজতে গিয়ে ধরা পড়ে অবধি আর এমন কোন কাজ করিনি—যাতে ওদের মনে একটুও সন্দেহ হতে পারে যে, আমরা পালাতে চাই। বরং পাকে-প্রকারে এইটেই দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, আমরা নিরুপায়।

সমী:রর সঙ্গে পরামর্শের পর এখানেই বসবাসের সুখ-সুবিধার দিকে মন দিয়েছি, কিন্তু এখান থেকে মুক্তির সুযোগ খুঁজতে চেষ্টার ত্রুটি নেই।

এখানকার ঘর-কন্না আমরা বেশ গুছিয়ে নিয়েছি। বাঁশের মাচার ওপর পেতেছি পুরু করে শুক্‌নো পাতা; ছটা দিয়ে শালপাতা বেঁধে করেছি বালিশ। দু'টো মাটির কলসী যোগাড় করে তার মধ্যে প্রতিদিন দু'চার মুঠো চাল জমাই—ভাগ্যক্রমে যদি কোনদিন পালাবার সুযোগ ঘটে, তবে পথের সম্বল হিসাবে। ঘরের ভেতর থেকে দরজার একটা খিল করেছি—হঠাৎ যাতে ওরা কোনও কারণে ঘরে ঢুকতে না পারে।

এখন দু'চারজন লোক আমাদের কাছে আসে—আমরাও অবাধে তাদের সঙ্গে মেশবার সুযোগ পেয়েছি। মনে আনন্দ হচ্ছে—ওরা তা হ'লে আমাদের ওপর পাহারা একটু কমাবে।

আলাপ হয়েছে অনেকের সঙ্গে। গোপনে তাদের কিছু-কিছু কথা শুনেছিও। সকলেই তাদের কুলী নয়—আমাদের মত ভদ্রসন্তানও এদের ফাঁদে পা দিয়ে আটকে পড়েছে। তাদের দেখে দুঃখ হয়। কুলী-মজুরদের সঙ্গে মিশে মিশে তারাও দলে ভিড়ে গেছে—পরিচয় ছাড়া, ভদ্রতা তাদের দেহে বা মনে কোথাও আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

তাদের দেখি, আর মুক্তি না পেলে ভবিষ্যতে আমরা কি হব', ভেবে শিউরে উঠি। এ গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে আশার আলো দেখা যায় না। রাত্রি ভোর হ'য়ে যায়; চোখে ঘুমের লেশ নেই।

আমাদের ঠিক পাশের ঘরে যে লোকটি থাকে, তার নাম দুনিয়া সিং। লোকটাকে দেখে যতদূর বুঝেছি, তাতে মনে হয়, অত্যন্ত সরল। বাঙ্গালী না হ'লেও তার সঙ্গে মিশতে আমাদের একটুও বাধেনি। দুনিয়া সিং এখানে আজ প্রায় দশ বছর আছে। এখানকার অনেক কিছুই তার জানা—এমন কি এই চক্র-ব্যূহ থেকে বেরুবার পথ পর্য্যন্ত সে জানে।

দুনিয়া সিং-এর সঙ্গে সমীর বেশ ভাব জমিয়ে নিয়েছে।

ইচ্ছে, কথায় কথায় এর কাছ থেকে পথের সন্ধান জেনে নেওয়া।

এই তিনদিন রাত্রে যে ভাল করে ঘুমিয়েছি, এমন কথা মনে পড়ে না। রাত্রি যখন নিশুতি হয়—চারদিক ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে, তখন আমাদের গোপন পরামর্শ আরম্ভ হয়। কত সম্ভব-অসম্ভব আলোচনা—কত সুখের রঙিন্ ছবি।

বিপদের মধ্যেই মানুষের দেখছি প্রকৃত বন্ধুত্ব—একজন অপরের যথার্থ নিকটবর্ত্তী হয়। সমীর আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু, কিন্তু আজ যেন সে আমার শুধু বন্ধু নয়—আমারই দেহের একটী অংশ।

ঘরের চালের কাছে যে ছোট গর্ত্তটা জানালার কাজ করে—তারই মধ্যে দিয়ে রাত্রির আকাশের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। গর্ত্তের ফাঁক দিয়ে পূব আকাশের গায়ে জ্বল্‌জ্বলে সুখতারাটি দেখা যাচ্ছে। তারই দিকে তাকিয়ে সমীর বল্‌লে, ভুনিয়া সিং-এর কাছে কিছু কিছু পথের সন্ধান আভাসে জেনেছি, তপন, তবে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করতে সাহস করছি না। দু' পাঁচ দিনের মধ্যে মোটামুটি জান্‌তে পারব বলে আশা হয়।

বল্‌লুম, খবরদার সমীর, মনের কথা বিশ্বাস করে কারও কাছে প্রকাশ করিস্ নি। এখানকার ধূলিকণাটা পর্য্যন্ত রাজেনবাবুর চর। আভাসে ইঙ্গিতেই জান্‌তে চেষ্টা কর্।

দু'পাঁচ দিন দেরীতে আমাদের বিশেষ কিছু এসে যাবে না—এ অবস্থা এখনো তেমন অসহ্য হ'য়ে প'ড়েনি।

কি কুক্ষণেই যে মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়েছিল জানি না, রাত্রি ভোর হতে না হতেই তার ফল হাতে হাতেই পেলুম।

ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস লাগতেই হ'ক বা সারারাত্রি জাগার দরুণই হ'ক—একটু তন্দ্রা এসেছিল। হঠাৎ বাইরে থেকে দরজায় ধাক্কা দেবার শব্দে চম্‌কে জেগে উঠলুম। দরজা খুলতেই দেখি, সামনে দাঁড়িয়ে শঙ্কর—শঙ্করের পাশে অপর একটি লোক।

লোকটার দিকে চেয়ে চোখের পলক পড়ল না। একি জল হাওয়ার গুণ, না আমরা শয়তানের আড্ডায় এসে পড়েছি!

লম্বায় সে বোধ হয় সাড়ে ছ'ফুট, চওড়াতেও ঠিক তার উপযুক্ত। প্রকাণ্ড মুখখানার মধ্যে ভাঁটার মত চোখ দু'টোই শুধু নজরে পড়ে। রঙ্ কাফ্রিদেশেই মানায়। দৈত্য কখন চোখে দেখিনি, কিন্তু কেউ যদি দৈত্য বলে এর পরিচয় দেয়, তাকে বিশ্বাস না করবার কোন কারণ দেখি না।

শঙ্করের সঙ্গে সঙ্গে লোকটা ঘরের ভেতর এল। আমাকে আর সমীরকে একবার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত দেখে নিয়ে শঙ্করের দিকে ফিরে বল্‌লে, এরা কতদিন এখানে এসেছে শঙ্কর?

শঙ্কর উত্তর দিলে, আজ্ঞে, আজ চারদিন

দেখলুম, লোক বুঝে শঙ্কর ভদ্র-ভাষা ব্যবহার করতেও জানে।

লোকটা বেরিয়ে যেতে যেতে শঙ্করকে উদ্দেশ করে বল্‌লে, তবে আজ থেকে ওদের কাজে লাগিয়ে দাও।

সে চলে যেতেই শঙ্করের হাত দু'টো ধরে বল্‌লুম, ও কে শঙ্কর ?

আমার অসহায় অবস্থা দেখে, শঙ্কর বোধ হয় খুসী হ'ল, বল্‌লে, উনি নীরদবাবু।

নীরদবাবু ? ঠিক বটে, রাজেনবাবুর পরে ইনিই আমাদের ভাগ্য-বিধাতা।

শঙ্কর বল্‌লে, তোমাদের চাল-ডাল এখুনি আস্‌ছে। তাড়াতাড়ি খেয়ে-দেয়ে দশটার মধ্যে 'রেডি' হ'য়ে থাকবে।

বল্‌লুম, শঙ্কর, নীরদবাবু আমাদের কাজে লাগাবার কথা বল্‌লেন, না ? কি কাজ আমাদের করতে হবে ?

নির্ব্বিকার ভাবে শঙ্কর বল্‌লে, সকলে যা করে থাকে—গাছ কাটা।

সমীর বল্‌লে, গাছ আমরা কাট্‌তে জানি না।

ঠাট্টার সুরে শঙ্কর বল্‌লে, সকলেই কি আর গাছ কাট্‌তে শিখে আসে বাবু ? কোড়ার চোটে সকলেই শিখে নেয়।

শঙ্করের ঠাট্টা শুনে সমীরের মুখ দেখি, রাগে কঠিন হয়ে

উঠেছে। ইসারায় সমীরকে চুপ করতে ব'লে শঙ্করকে বল্লুম, ভাই, ও সব তো আমরা মোটেই জানি না—আমাদের কাজ শেখাতে হবে তোমাকে।

খোসামোদে তুষ্ট হয় না এমন মানুষ বোধ হয় জগতে নেই। তাকে মুরুব্বি বলে স্বীকার করতে শঙ্কর খুসী হ'ল। বল্লে, আমি কোন রকমে এক সপ্তাহ তোমাদের কাজের রিপোর্ট আট্কাতে পারব—সে যে কত কষ্টে, তা তোমরা বুঝতে পারবে না। তারপরে তোমরা কাজ শিখে নিতে পার ভালই—আমার দ্বারা কোন উপকারই তখন আশা ক'র না।

বল্লুম, ভাই, অপরিচিত হ'য়ে তুমি এই যে দয়া দেখালে—ক'জনের কাছে এ রকম পাওয়া যায়? আমরা প্রাণপণে এ ক'দিনে কাজ শিখে নিতে চেষ্টা করব।

দশটার মধ্যে তৈরী হ'য়ে নেবার জন্যে আর একবার মনে করিয়ে দিয়ে শঙ্কর বিদায় নিলে।

আরামের একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লুম, যাক্, তবু এক সপ্তাহের মত নিশ্চিন্ত।

সমীর বোধ হয় শঙ্করের চলে যাওয়ার অপেক্ষাই করছিল, এখন রাগে মুখ হাঁড়ি-পানা করে বল্লে, কি বলে তুই ওর পায়ে ধর্তে গেলি?

বল্লুম, সমীর, মাথা গরম করিস নি ভাই। আমরা এখন

সম্পূর্ণ ওদের মুঠোর মধ্যে। অবাধ্যতার ফলে যদি ওরা কোন শাস্তি দেয়, তবে আমাদের পালাবার সমস্ত মতলবই ফেঁসে যাবে। ওদের শক্তি কতখানি—তা যখন ঠিক জানা নেই, তখন উপযুক্ত সময় না আসা পর্য্যন্ত ওদের বাধ্য হ'য়ে চলা বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি?

সমীর আমার কথার কোন জবাব দিলে না। তবে ওর মুখ দেখে বুঝলুম, আমার কাজটা ও সমর্থন করতে পারছে না।

দশটা বাজতেই শঙ্কর এসে হাজির। আমরাও কালবিলম্ব না করে তার সঙ্গ নিলুম। সার বেঁধে চলেছি প্রায় পঞ্চাশ জন লোক। সামনে, পেছনে, আশে-পাশে চলেছে সর্দ্দারের দল।

আমাদের কুঁড়েগুলো ছাড়িয়ে বনে ঢোক্‌বার মুখেই একটা ঘরে কতকগুলা কুড়ুল ছিল—সর্দ্দারেরা সেখান থেকে প্রত্যেককেই এক একখানা করে দিলে। শুনলুম, ফেরবার সময় ও গুলো আবার জমা দিতে হয়।

কুড়ুল ওরা সঙ্গে রাখতে দেয় না; সশস্ত্র হয়ে লোকে বিদ্রোহ করতে পারে, বোধ হয় এই ভয়ে।

সর্দ্দারেরা ও দেখলুম, এক একটা করে পিস্তল আর এক-গাছা করে চাবুক নিলে। চাবুকটা বোধ হয় পোষ মানাবার, আর পিস্তলটা বিদ্রোহ দমন করবার জন্যে।

এইবার আমরা বনের মধ্যে চলেছি। যতই এগোচ্ছি, ততই

যেন দিনের আলো নিভে এসে গোধূলির আভা ছড়িয়ে পড়ছে। চারধারে কি বিরাট নিস্তব্ধতা, পায়ের তলার শুকনো পাতা মাড়ানোর শব্দেই চমকে উঠছি।

ছোট ছোট ঝোপ মাড়িয়ে, লতাপাতা সরিয়ে, কোন রকমে পথ করে চলেছি। মাঝে মাঝে কতকগুলো গাছের গায়ে দাগ কাটা। বল্লুম, শঙ্কর, এ দাগগুলো কিসের বল ত ?

গম্ভীর হ'য়ে শঙ্কর বল্লে, আমি আর শঙ্কর নই, এখন সর্দ্দার।

সমীর দেখি, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে। মনের অবস্থাটা কোন রকমে চেপে, সহজ সুরে বল্লুম, বেশ, এখন থেকে তোমাকে সর্দ্দারই বলব, কিন্তু এই দাগগুলো কিসের তা ত বল্লে না ?

শঙ্কর বল্লে, ওই গাছগুলোই কাটতে হবে, তাই চিহ্ন করে দিয়েছে।

বনটা কতকগুলো ভাগে ভাগ করা ; প্রত্যেক ভাগে এক একজন সর্দ্দার মোতায়েন থাকে। সে তার কুলীদের দিয়ে সেখানকার গাছগুলো কাটায়।

শঙ্কর তার নিজের জায়গায় এসে আমাদের থাম্‌তে বল্লে। অন্য সর্দ্দারেরা তখনও কিন্তু বনের মধ্যে এগিয়ে চলেছে।

আমাদের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আরও জন দশেক কুলী সেখানে থেমে পড়ল। বুঝলুম, এরা শঙ্করের কুলী ; আমাদের সহকর্ম্মী।

পৌঁছবার মিনিট পাঁচেক বাদেই কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। শব্দহীন বনভূমি হঠাৎ ধপাধপ্ কুড়ুলের আওয়াজে কেঁপে উঠল; সে শব্দ শুনে মনে হ'ল, এ যেন শুধু শব্দ নয় এর সঙ্গে মিশে আছে এই অচল, অনড় গাছগুলোর অকারণ নির্য্যাতনের নিষ্ফল অভিযোগ।
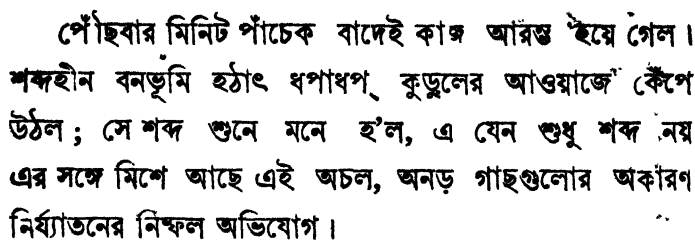
হয়ত একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম। হঠাৎ বিকট হুঙ্কারে চকিত হয়ে ফিরে চাইতেই দেখি, শঙ্করের হাতের চাবুক পড়ছে এক হতভাগার পিঠে। যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে কাঁদবার যো নেই, চোখের জল মুছবার সময় নেই—সমানে কোপের পর কোপ চালিয়ে যেতে হবে। ক্লান্ত হ'য়ে কাজ থামাবার জন্যেই ত এই শাস্তি। হতভাগ্যের গভীর নিঃশ্বাস ফেলবার অধিকার আছে—অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভগবানের কাছে নালিশ জানাতে। নিঃশব্দে চোখের জল ফেলে জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করবার স্বাধীনতাও তার আছে দেখলুম।

গায়ের রক্ত গরম হ'য়ে উঠল—ঝন্ ঝন্ করে উঠল মাথার ভেতরটা। মনে হ'ল, শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকতে অন্যায়ের কোন প্রতিকারের চেষ্টা না করে বেঁচে থাকার কি সার্থকতা?

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঠাণ্ডা হ'য়ে এল। মনে হ'ল, এর প্রতিবাদ করতে যাওয়া মানে জেনে শুনে আগুনে হাত দেওয়া। এতে দু'জনের লাঞ্ছনা বাড়বে বই কমবে না।

এই সময় আমাদের দিকে ফিরে শঙ্কর চেঁচিয়ে উঠল, তোমাদের দাঁড়িয়ে থাকলে চল্‌বে না। ওই বড় গাছটা কোপাও গে।

তথাস্তু। দু'জনে সেই গাছটার ধারে গিয়ে কুড়ুল চালাতে লাগলুম। কুড়ুল তুলে গাছের গোড়ায় আঘাত করি, কিন্তু সে আঘাতে গাছের কোন ক্ষতি হয় না। কুড়ুলটা বেঁকে যায়।

সমীরেরও সেই দশা!

প্রায় আধঘণ্টা চেষ্টার পর গাছ কাটবার কৌশলটা আয়ত্ত করলুম। বেলা চারটে পর্য্যন্ত চেষ্টার পর গাছ যতটুকু কাটা হ'ল, তাতে বুঝলুম, গাছটা সম্পূর্ণ কাটতে আমাদের সপ্তাহ তিনেক লাগতে পারে।

বেলা চারটে বাজতেই আমাদের ছুটি হ'য়ে গেল। কুড়ল জিম্মা করে দিয়ে অবসন্ন দেহে আমরা ফিরে এলুম।

মাচার ওপর দেহটা এলিয়ে দিয়ে বল্‌লুম, সমীর, শঙ্কর দেখছি, তার কথা রেখেছে। তবে মাঝে মাঝে যা ধমকেছে, সে শুধু অপরকে দেখাবার জন্যে।

সমীর উত্তরে কিছুই বল্‌লে না, বোধ হয় অন্যমনস্ক ছিল।

বল্‌লুম, কি ভাবছিস্?

আমার দিকে ফিরে একটু ম্লান হেসে সমীর উত্তর করলে, ভাবনা কি একটা, তপন? কোন্‌টার কথা বল্‌ব?

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙ্গতে উঠতে গেলুম, কিন্তু পারলুম না—সমস্ত শরীরে অসহ্য বেদনা!

সমীরের দিকে চাইতেই দেখি, সে শুয়ে শুয়ে হাসছে। বল্‌লুম, সমীর, হঠাৎ শরীরে এত ব্যথা হয়েছে যে, হাত পা নাড়তে পারছি না। কেন বল ত?

তেমনি হাস্‌তে হাস্‌তেই সমীর বল্‌লে, অসুখ-বিসুখের ভয় করিস্ নি। কাল যে রকম উৎসাহের সঙ্গে গাছ কোপাচ্ছিলি, তাতে শরীরে ব্যথা না হওয়াই আশ্চর্য্য! আমারও ঘুম ভেঙ্গেছে কোন ভোরে—কেবল ব্যথার জন্যে উঠিনি।

বল্‌লুম, সবই না হয় বুঝলুম; কিন্তু এই পাকা ফোঁড়ার মত ব্যথা নিয়ে আজকে হাত নাড়ব কি করে? শঙ্করকে আজ একবার বলে দেখতে হবে।

সমীর বল্‌লে, তাতে কোন ফল হবে বলে মনে হয় না। 'বিষস্য বিষমৌষধি' বলে একটা কথা আছে জানিস ত! এক্ষেত্রে সেইটেই খাটে। শঙ্কর বল্‌বে, কাজ করে হাতে ব্যথা হয়েছে, কাজ করলেই সেরে যাবে!

সমীরের কথার আর কোন জবাব দিলুম না। কষ্ট যতই হ'ক্, লাঘব করবার যখন কেউ নেই, তখন মায়া বাড়িয়ে কি লাভ? উঠে পড়লুম। সমীরও উঠল।

যথাসময়ে শঙ্কর এসে হাজির হ'ল। ব্যথার কথা

জানিয়ে তার কাছে দয়া ভিক্ষা করতে কেমন লজ্জা করতে লাগল। বল্‌লুম, শঙ্কর, কালকের কুড়ুল চালানোর ফলে হাতে ভয়ানক ব্যথা হয়েছে।

শঙ্কর দেখলুম, সমীরেরই কথার পুনরাবৃত্তি করলে।

বনে হাজির হ'য়ে যথাসময়ে কাজে লেগে গেলুম।

৮

কাজে লেগেছি আজ সাতদিন। শঙ্কর কাজ শিখে নেবার জন্যে যে সাতদিন সময় দিয়েছিল আজ তার শেষ দিন। কাজ শিখতে যে একদম ফাঁকি দিয়েছি তা নয়, বরং সাধ্যমত চেষ্টাই করেছি। কিন্তু যা শিখেছি, তাতে কেউ সন্তুষ্ট হবে না। অন্য লোক যে কাজ এক দিনে করে, আমরা তার তিন ভাগের একভাগও করতে পারি না।

কাল শঙ্করের মুখে শুনলুম, এবার আমাদের অন্য সর্দ্দারের কাছে কাজ করতে হবে। সাত দিন অন্তর এখানে সর্দ্দার বদল হয়। তার কারণ বোধ হয়, এরা সর্দ্দারের সঙ্গে কুলীদের বেশী মেলামেশা করতে দেয় না।

শুনে অবধি মনটা ভাল নেই। এ সাতটা দিন কেটেছে মন্দ

নয়। শঙ্কর কোনদিন খারাপ ব্যবহার করেনি। তার ব্যবহার কতকটা সহ্য হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এবার যে আসবে সে কি রকম হবে—মনের মধ্যে সকল সময় এই কথাটাই তোলপাড় করতে লাগল।

অনাগতের সম্বন্ধে সকল সময়ই মানুষের এমনি ভয়-ভাবনা-সন্দেহ হয়।

আজ যখন কাজে বেরোলুম, আকাশ তখন মেঘে ঢাকা; সূর্য্য মেঘের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বোধ হয় একটু বিশ্রাম করছেন। মেঘলা-দিন মনটাকে স্নিগ্ধ-সরস করে তোলে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক কাজ করেছি হঠাৎ বনের মধ্যেকার স্বল্প-আলোটুকু অদৃশ্য হ'য়ে গেল। তারপর আরম্ভ হ'ল, ঝড়ের মাতামাতি। সেই দিগন্ত-বিস্তৃত অরণ্য যেন ছোট ছেলের হাতের মত শাল আর শিশু গাছের শাখাগুলো নাচিয়ে হাতছানি দিয়ে মেঘকে ডাকছে—খেলা করবার জন্যে। কখনো বা ঝাঁকড়া মাথা দুরন্ত ছেলের মত গাছের মাথাগুলো লুটিয়ে খল্‌খল্ করে হেসে উঠছে।

কি সুন্দর দৃশ্য! সামান্য ঝড়ের ভেতর যে এমন মন-মাতান জিনিষ থাকতে পারে, তা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিনি। এ দৃশ্য কোনদিন ভোলবার নয়।

তারপরই আরম্ভ হ'ল বৃষ্টি। চোখের পলকে সমস্ত

বনভূমির রূপ গেল বদ্‌লে। জলে গাছগুলো স্নান করে কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে!

কাজ-কর্ম্ম বন্ধ করে, আমরা এক প্রকাণ্ড শিশুগাছের তলায় এসে দাঁড়িয়েছি। গাছটা বৃষ্টির জলে ভিজে যেতেই ঝর্‌ঝর্‌ করে নীচে জল পড়তে লাগল—আমরাও গেলুম নেয়ে।

বৃষ্টিধারা ঝর্‌ছে ত ঝর্‌ছেই; এর যেন আর শেষ নেই। পৃথিবীকে আজ জলে ভাসিয়ে দিয়ে তবে বোধ হয় মেঘগুলো ঠাণ্ডা হবে।

জামা কাপড় কখন ভিজে গেছে। ঠাণ্ডায় এখন বুকের ভেতর ধরেছে কাঁপুনি। বৃষ্টি থামবার কোন আশা নেই দেখে, শঙ্কর আমাদের ফেরবার হুকুম দিলে।

ঘরে এসে তাড়াতাড়ি কাপড়-জামা খুলে শুয়ে পড়লুম। উঃ, কি শীত! হাড়ে-হাড়ে যেন ঠোকাঠুকি লেগে যায়।

সেই যে শুয়েছি, তারপর আর কিছুই জানি না। যখন ঘুম ভাঙ্গল, সকাল হ'য়ে গেছে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। তৃষ্ণায় গলাটা গেছে শুকিয়ে কাঠ হয়ে। একবার উঠতে চেষ্টা করলুম, কিন্তু গা-মাথা এত ঘুরছে যে, পারলুম না। ডাক্‌লুম, সমীর, সমীর!

ধড়মড় করে উঠে সমীর বল্‌লে, কিরে তপন, ডাকছিলি?

বল্‌লুম, হ্যাঁ, ভাই। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল

দিবি? উঠতে চেষ্টা করলুম, কিন্তু গা-মাথা এত ঘুরছে যে, পারলুম না।

সমীর নেমে আমাকে জল এনে দিলে। আমার কপালে হাত দিয়েই সে চমকে উঠল, বললে, ইস্! তোর গা যে একেবারে পুড়ে যাচ্ছে, তপন!

বললুম, আমার জ্বর হয়েছে, না? মাথাটার মধ্যে যে রকম যন্ত্রণা হচ্ছে, তাতে হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়।

সমীর চিন্তিতভাবে বললে, কাল ঐ জলে ভেজা...তারপর আমাকে সাহস দেবার জন্যে বোধ হয় বললে, তুই ভাবিস্ নি তপন, ও একদিন উপোস দিলেই সেরে যাবে। ভাগ্যিস্ কাল তোকে জোর করে ভাতগুলো খাওয়াইনি!

একটু বাদে যে আমাদের চাল-ডাল দিতে এল, সমীর তাকে আমার জ্বরের কথা শঙ্করকে জানাতে বলে দিলে।

বেলা আটটা আন্দাজ শঙ্করের সঙ্গে নীরদবাবু আমাদের ঘরে দ্বিতীয়বার পদার্পণ করলেন। আমার নাড়ী আর জিভ্ পরীক্ষা করে বললেন, ও কিছু না; আমি ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি, খেলে সেরে যাবে। তারপর শঙ্করকে বললেন, এর খাবার জন্যে কিছু সাবু পাঠিয়ে দাওগে, শঙ্কর।

তারপর তাঁরা দু'জনেই বিদায় নিলেন।

আমার আজ কাজ থেকে ছুটি। সমীরের কাজে যাবার

সময় হ'য়ে এল। আমার হাতের কাছে জল, সাবু সব এগিয়ে দিয়ে সমীর বললে, সমস্ত ঠিক করে রেখে গেলুম, তপন। দরকার মত নিয়ে খাস্। বিকেলে এসে দেখব, তোর আর জ্বর নেই, কেমন ?

বললুম, হ্যাঁ। সমীরের কথা শুনে আমার চোখ দু'টো জলে ভরে এল। এখানে আমাকে এত জ্বরের মধ্যে ফেলে যেতে, তার মনের মধ্যে যা হচ্ছে—কথা বলে সে যতই ঢাকা দিতে চাক্ না কেন—মুখের চেহারায় তা ধরা পড়ে গেল।

আমার মাথায় একবার হাতটা বুলিয়ে দিয়ে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

সারাদিন একা পড়ে রইলুম। মনের মধ্যে কত ভাবনা যাওয়া আসা করতে লাগলো। কিন্তু মাথার যন্ত্রণায় কোনটাতেই মন দিতে পারলুম না। এরপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, জানি না।

কপালে কি একটা ঠাণ্ডা জিনিষের স্পর্শে ঘুম ভেঙে গেল। ধীরে ধীরে চোখ মেলে চাইলুম। দেখি, সমীর কাজ থেকে ফিরে এসে—আমার কপালে তার ঠাণ্ডা হাতখানা রেখে জ্বরের তাপ অনুভব করছে।

সমীরের খোলা গায়ের দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলুম। ও-গুলো কিসের দাগ? কই সকালে ত ও-গুলো দেখিনি!

মনটা ব্যথায় ভ'রে উঠল; জিজ্ঞাসা করলুম, সমীর, তোকে ওরা চাবুক মেরেছে?

আমি যাতে এ ঘটনাটা জান্‌তে না পারি, সে বিষয়ে সমীরের বোধ হয় লক্ষ্য ছিল। কেন না, আমার কথা শুনে সে চম্‌কে উঠল। আর গোপন করতে যাওয়া বৃথা বুঝে বল্‌লে, হ্যাঁ, ওরা মেরেছে বটে, কিন্তু আমার বিশেষ লাগে নি।

লাগলেই বা আমি তার কি প্রতিকার করতে পারি? সমবেদনা প্রকাশ করে অপমানটা আর ভারী করতে ইচ্ছে হ'ল না।

৫

ধন্বন্তরি নীরদবাবুর ওষুধের গুণেই হ'ক, আর আমার রোগ ভোগ শেষ হ'য়ে থাকার দরুণই হ'ক, তিন দিন বাদে জ্বর আমাকে ছেড়ে পালাল।

অসুখ-বিসুখ—ওরা সব সুখী জীব। খোঁজে সুখ-তোয়াজ! আমাকে একান্ত হতভাগ্য দেখেই বোধ হয় ঘৃণাভরে ছেড়ে চলে গেল।

সেই মার খাবার পর থেকেই সমীরকে কেমন চিন্তিত দেখছি। অবশ্য আমার খুঁটিনাটি প্রত্যেক অসুবিধাটির প্রতি তার সজাগ দৃষ্টি আছে—তবুও তার মুখ দেখে এটা বুঝতে বাকী থাকে না।

আরো দু'দিন বাদে শঙ্কর এসে জানালে, এবার আমাকে কাজে যোগ দিতে হবে। শরীর তখনও দুর্ব্বল, কিন্তু তার খোঁজ নেবে কে?

নতুন সর্দ্দারটি যেন বারুদের স্তূপ, আমরা ইন্ধনশলাকা। কারণে-অকারণে সে জ্বলেই আছে। তার ক্ষমতা যে অসীম, ইচ্ছে করলে সে যে ছাগল, ভেড়ার মত আমাদের পিঠের ছালগুলো আস্তো খুলে নিতে পারে—এ দর্প তার চলার ভঙ্গিমায়, কথার সুরে, সর্ব্বক্ষণ ফুটে বেরোয়। এ-ই সমীরকে শাস্তি দিয়েছিল—কেন তা জানি না।

কিন্তু দেখলুম, সে আর আমাদের কাছে বড় একটা ঘেঁষে না—দূর থেকেই হুমকি দিয়ে সারে। কে জানে কেন?

সেদিন রাত্রে সমীরকে কেমন খুসী দেখলুম। এ কদিন তার মুখে যে চিন্তার ছাপ দেখেছি—আজ আর তার চিহ্ন-মাত্র নেই।

খাওয়া-দাওয়া সেরে দু'জনে দু'জনের মাচায় আশ্রয় নিলুম। শুয়ে দু'জনেই নিজের নিজের চিন্তায় ডুবে থাকি। কথা আর বড় কেউ কারুর সঙ্গে বলি না। বলবার মত নতুন কথাই বা কই? কথা আমাদের ফুরিয়ে গেছে।

হঠাৎ সমীরের ডাকে আমর চিন্তা-সূত্র গেল ছিঁড়ে। চকিত হ'য়ে বল্‌লুম, সমীর, ডাক্‌লি ?

সমীর বল্‌লে, হ্যাঁ, তুই জেগে আছিস্ কি না দেখছিলুম। বলেই সে আস্তে আস্তে আমার মাচা র ওপর উঠে এল। আমি উঠে সমীরকে বস্‌তে দিলুম।

ভাল করে বসে সমীর বল্‌লে, অতদূর থেকে কথাবার্ত্তা বলা ঠিক নয়। তাই এখানে উঠে আসতে হ'ল। আমার এতদিনকার সাধনার এইটেই হ'ল মন্ত্র। জানিস্ ত তিন কাণ হ'লেই সর্ব্বনাশ !

সমীরের কথা শুনে আমার মনের মধ্যে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব চল্‌ছিল। সমীর কি এতদিন ধরে আমাদের মুক্তি-সাধনা করছিল নাকি ?

ঠিক তাই ! একটু থেমে সমীর বল্‌লে, ঢুনিয়া সিং-এর কাছে পথের সমস্ত সংবাদই আমার জানা হ'য়ে গেছে। তাই থেকে এই কাগজে আমি পথের একটা মোটামুটি নক্সা তৈরী করেছি। এই দেখ।—কথাশেষে সমীর আমার হাতে একখণ্ড কাগজ দিলে।

একান্ত আগ্রহে সমীরের হাত থেকে কাগজখানা নিলুম। মনে হ'ল, সমীর আমাকে একখণ্ড কাগজ দিলে না—দিলে সাত রাজার ধন এক মাণিক ! এ দৈত্যপুরী থেকে পালাবার একমাত্র কলকাঠি।

বল্‌লুম, এখন থাক্, কাল সকালে এটা দেখব।

সমীর বল্‌লে, আসল কাজ—পথের সন্ধান যখন জানা হ'য়ে গেছে, তখন আর দেরী করা হবে না। বিপদ যে কখন কোন্ পথ দিয়ে দেখা দেয়—বলা কঠিন।

বল্‌লুম, দেরী করার কোন কারণ ত দেখি না। এ আমাদের বাড়ী ঘর নয় যে, বিলি-ব্যবস্থা করে যেতে হবে. আর আত্মীয় পরিজনও কেউ নেই যে, জানিয়ে যেতে হবে বিদায়-সম্ভাষণ। আমরা আজই ত যাত্রা করতে পারি, সমীর?

আমার কথা শুনে সমীর যে হাস্‌লে—তা এই অন্ধকারেও আমি দেখতে পেলুম। সে বল্‌লে, তোর সব কথাই আমি মানছি তপন, তবুও আজ আমরা বেরোতে পারি না।

বল্‌লুম, কেন? বাধা কিসের?

সমীর বল্‌লে, আসল কথাটা তুই ভুলে যাচ্ছিস্ তপন। এ তোর বাড়ী থেকে পার্কে বেড়াতে যাওয়া নয়। গভীর বনে আমাদের পথ চিনে অগ্রসর হ'তে হবে। সেখানে না আছে লোকের বসতি, না আছে রাত কাটাবার মত নিরাপদ স্থান। আমাদের কাছে কাণা কড়িটি নেই—তার জন্যে বিশেষ ভাবিও না। বনের মধ্যে যদি খাবার মেলে ত বিনা পয়সাতেই মিল্‌বে। নইলে হাজার পয়সা ছড়ালেও কড়ার কুটোটি পাবো না। কিন্তু যেটা খাবার-দাবার, পয়সা-কড়ি—সকলের ওপর দরকার,

তার কোন ব্যবস্থা না করে, এক পা-ও ত এগোতে পারব না।

সমীরের কথা শুনে আশ্চর্য্য হ'লুম। টাকাকড়ি, খাবার-দাবার ছাড়া এমন আর কি দরকারী জিনিষ থাক্‌তে পারে তা হঠাৎ মনে পড়ল না। বল্‌লুম, এমন কি জিনিষ...

আমার কথা শেষ হ'তে না হ'তেই সমীর বল্‌লে, অস্ত্র—অস্ত্র। অস্ত্র ছাড়া বনপথে এক পা-ও বাড়াবার উপায় নেই। বনের সব নিয়মই আলাদা তপন, এ তোর সহর নয়। এর প্রতি পদেই বিপদ তোকে গ্রাস করবার জন্যে হাঁ করে আছে। এখানে দুর্ব্বলের বাঁচবার অধিকার নেই। হয় দেহের সামর্থ্যে, নয় কৌশলে, নয় অস্ত্র-শস্ত্রে তোকে বলীয়ান হ'তে হবে।

সমীরের কথা শুনে সমস্ত উৎসাহ নিভে গেল। সামান্য একটা পেন্সিল-কাটা ছুরিই নেই—বাঘ-ভালুকের সঙ্গে লড়বার মত অস্ত্র পাব কোথায়?

আমার মনের কথাটা বোধ হয় সমীর বুঝতে পারলে; বল্‌লে, তপন, বিপদে পড়ে হাল ছেড়ে দিয়ে কেউ কখন সমুদ্র পার হয়েছে বলে শুনেছিস্? অভাব কখন আপনা হ'তে দেখেছিস্ মিটতে? উপায় আমাদের খুঁজে বার করতেই হবে। কি করলে দু'টো অস্ত্র পেতে পারি, এখন থেকে তাই ভাব, এরই ওপর আমাদের যাওয়া নির্ভর করছে।

বল্‌লুম, তা ত বুঝলুম, কিন্তু কি রকম অস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে?

সমীর বল্‌লে, বন্দুক-রিভলভারের কথা ছেড়ে দিলুম, তপন। তবে ঐ মাংস-থোড়া ছুরির মত যে বড় বড় ছুরি ওদের আছে, ঐ রকম দু'খানা হ'লেই আমরা সাহস করে যাত্রা করতে পারি। আচ্ছা, এবার ঘুমো তুই, আমি শুতে চল্‌লুম।

মাথায় একটা চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়ে সমীর শুতে গেল। আমার চোখে কিন্তু ঘুম এল না। কেবলই মনে হ'তে লাগল, একটা উপায়—শুধু একটা উপায় হ'লেই আমাদের এ যাতনার অবসান হয়।

ঘুম আর এল না—মাথা উঠল গরম হ'য়ে। মাচা থেকে নেমে ঘরের মধ্যে পায়চারি সুরু করে দিলুম। এক সময় দাঁড়িয়ে পড়ে, সেই গর্ত্তটার মধ্যে দিয়ে তাকালুম, বাইরের দিকে। পূবের আকাশে ফুটে উঠেছে শুকতারাটি; বুঝলুম, ভোর হ'য়ে এসেছে। হঠাৎ একটা উপায় মনে পড়ে গেল। এটা সম্ভব হওয়া বোধ হয় খুব কঠিন হবে না। তখনই সমীরকে ডেকে শুনিয়ে দিতে ইচ্ছে হ'ল, কিন্তু তা সামলে নিলুম। ঠিক করলুম, সমীরকে একেবারে কাজে দেখিয়ে দোব, তার আগে এক বর্ণও জানাব না।

পরের দিন কাজ শেষ করে ফিরে এলুম—কুড়ুল জমা দিতে।

কুড়ুল জমা দিয়ে হঠাৎ যেন একটা অন্যায় করে ফেলেছি, এমনি ভাব দেখিয়ে সর্দ্দারকে বল্‌লুম, সর্দ্দার, আমাদের রাঁধবার একখানাও কাঠ নেই, যদি একবার কুড়ুলগুলো দাও, তবে বন থেকে তাড়াতাড়ি আজকের মত দু'জনে কিছু কাঠ কেটে আনি।

দু'টো অস্ত্র পাবার এই ফন্দিই করেছিলুম। এখন তা সফল হয় কিনা দেখবার জন্যে দুরু দুরু বক্ষে সর্দ্দারের আদেশের অপেক্ষা করতে লাগলুম।

কাঠ সত্যিই আমাদের কিছু ছিল, তাই সমীর আমার উদ্দেশ্য বুঝতে না, পেরে অবাক্ হ'য়ে আমার দিকে চেয়ে রইল।

এ রকম সমস্যায় বোধ হয় সর্দ্দারকে আর কখনও পড়তে হয় নি। তাই সে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইল। আমার মুখে অসহায়ের করুণ আবেদন ছাড়া আর কিছু দেখতে না পেয়ে, বোধ হয় তার দয়া হ'ল।

অস্ত্র-শস্ত্র যার তদারকে থাকে, তাকে ডেকে সর্দ্দার আমাদের দু'জনকে দু'খানা বড় ছুরি দিতে বলে দিলে। আমাদের কাটারি দেওয়া হ'লে বল্‌লে, সুরথ, তুমি চাবি দিয়ে নবীন বাবুকে চাবি দাওগে। কাল সকালে এগুলো ফেরৎ নিও।

কাটারি দু'টো নিয়ে আমরা বনের দিকে অগ্রসর হলুম। তারপর কিছু কাঠ-কুটো হাতে নিয়ে ঘরে ফিরে এলুম।

বোঝা নামিয়েই সমীর প্রশ্ন করলে, কাঠ থাকতেও তোর কাঠ কাটবার হঠাৎ সখ হ'ল যে?

বল্‌লুম, ভগবানকে প্রণাম কর সমীর যে, আমাদের আশা এত সহজে সফল হয়েছে। সত্যি তুই কি এখনও বুঝতে পারিস্‌ নি? দু'টো কাটারির কথা বলেছিলি—তা সংগ্রহ করবার জন্যে এই কৌশল। এই রাত্রেই আমরা যাত্রা করতে পারব।

এতক্ষণে ব্যাপারটা সমীরের বোধগম্য হ'ল। মুখ দিয়ে তার কোন কথা বেরুল না। নীরবে আমার হাতখানা তুলে নিয়ে জোরে জোরে বারকতক ঝাঁকুনি দিলে।

৬

দু'জনের মনই আনন্দে কাণায় কাণায় ভরে উঠল। যেন এই কঠিন মাটিতে আমাদের পা পড়ছে না, আমরা যেন হাওয়ায় ভাস্‌ছি! তাড়াতাড়ি রান্না শেষ করে খেয়ে নিলুম। এই কদর্য্য রান্নাই আজ মুখে অমৃতের মত ঠেক্‌ল।

গোছ-গাছের কি-ই বা আছে! যে চাল-ডাল এতদিন ধরে জমিয়ে এসেছি—এই সময়টির দিকে চেয়ে, তারই কতক

একখানা কাপড়ে বেঁধে নিয়ে রাত্রি একটু গভীর হবার প্রতীক্ষায় বসে রইলুম।

যে স্থানটি থেকে প্রতি মুহূর্ত্তে পালাবার জন্যে মনে-প্রাণে প্রার্থনা করছিলুম, আজ বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে তারই জন্যে কেমন মায়া হতে লাগল। আশ্চর্য্য মানুষের মন! এর প্রকৃত পরিচয় আজ পর্য্যন্ত বোধ হয় কেউ পায়নি।

অবশেষে সেই প্রার্থিত মুহূর্ত্তটি এল। জুতোর একটা পোঁটলা ক'রে সমীর কাঁধে নিলে, আমি নিলুম চাল-ডালের। তারপর দু'জনে হাতে দু'খানা কাটারি নিয়ে অজানা পথের দিকে পা বাড়িয়ে দিলুম।

বনের মধ্যে এসে পড়েছি। কি তিথি তা জানি না, তবে আকাশে চাঁদ নেই। চারদিকে জমাট অন্ধকার। শুধু মাথার ওপরে আকাশে নক্ষত্রের মেলা। পথ দেখাবার মত আলোর তেজ ওদের না থাকুক, এই বিশ্বব্যাপী অন্ধকারে ওরাই যেন সান্ত্বনা। অত্যন্ত সাবধানে পা ফেলে চলেছি। কি জানি, শুক্‌নো পাতার শব্দে যদি কোন অনিষ্ট হয়?

মনে হচ্ছে, এবার আমরা ওদের নাগালের বাইরে এসে পড়েছি, অর্থাৎ এখন চুপি চুপি কথা বল্‌লে, বিপদের ভয় নেই।

তবু সাবধানের মার নেই ; আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চলার পর বল্‌লুম, সমীর, অন্ধকারে পথ ভুল করিস্‌নি ত ?

সমীর বল্‌লে, না। ক'দিন ধরে আমি অনেক পরীক্ষা করে রেখেছি। তাতে পথের ভুল হবার কোন ভয় নেই।

শুনেছি, বুধ-শুক্র প্রভৃতি কতকগুলো গ্রহ মৃত ; অর্থাৎ তারা অবিরাম সূর্য্যের আকর্ষণে তাকে প্রদক্ষিণ করে ফিরছে নিজেদের গতিবেগ হারিয়ে—কিন্তু তাদের জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য ভুলে গেছে।

আমরাও সেইরকম এক মনে পথ চলেছি—ক্রমাগত চলা ছাড়া আর যেন আমাদের জীবনে কোন লক্ষ্যই নেই।

চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ দেখলুম, আকাশের একদিকটায় একটু আলো ফুটে উঠেছে। বল্‌লুম, সমীর, আকাশের ওদিকটা ফরসা হ'য়ে উঠেছে দেখ। বোধ হয় সকাল হ'য়ে এল।

থমকে দাঁড়িয়ে সমীর বল্‌লে, সকাল হ'তে এখনও অনেক দেরী, তপন। তা ছাড়া ওটা যে পশ্চিম দিক। তবে শিগ্‌গিরই চাঁদ উঠবে।

সমীরের কথাই ঠিক। সেই স্বল্প আলোয় সকল জিনিষ স্পষ্ট না দেখা যাক্‌—তার আবছায়াও দেখা যাচ্ছিল। এতে আমাদের পথ চলার সুবিধা বই অসুবিধা হ'ল না।

আবার যখন আকাশের দিকে চোখ পড়ল, দেখি, নীল

বনের বিস্ময়

আকাশে একফালি চাঁদ যেন সাদা মেঘের ভেলায় চ'ড়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। কি সুন্দর প্রকৃতি! কি মনোরম এর প্রত্যেকটি দৃশ্য!

এর কিছুক্ষণ পরেই ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস বইতে আরম্ভ করল। পশ্চিমের চাঁদ পশ্চিমেই অস্ত গেল। তবে বন আর অন্ধকারে ঢাকা পড়ল না। পূবদিকটা উষার আলোকে রাঙা হ'য়ে উঠল।

বনে জাগরণের সাড়া পড়ে গেল। কি বিচিত্র কলরব। মুগ্ধ বিস্ময়ে তাই শুনতে লাগলুম। এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের যিনি স্থষ্টিকর্ত্তা—মনে মনে তাঁর পায়ে সহস্রবার প্রণাম জানালুম।

আকাশে আরম্ভ হ'য়ে গেছে সাতটি রঙের খেলা! হঠাৎ সামনের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল, কতকগুলো কুঁড়ে। বল্লুম, সমীর, দেখ, আমরা বোধ হয় কোন গ্রামে এসে পড়েছি।

আমার কথা কাণে যেতেই সমীর সামনের দিকে চেয়ে চম্‌কে উঠল; চঞ্চল স্বরে বল্‌লে, একটু পা চালিয়ে আয়, তপন।

সমীরের ব্যস্ততা দেখে মনে কেমন ভয় হ'ল; বল্লুম, কোন বিপদের আশঙ্কা আছে নাকি রে?

সমীর বল্‌লে, হ্যাঁ। ওটা যে একটা গ্রাম—তাতে কোন ভুল নেই। তবে গ্রামবাসীরা জেগে ওঠবার আগে আমাদের এ গ্রাম ছেড়ে পালাতে হবে।

বল্‌লুম, কেন? এরা কে তুই জানিস্?

সমীর বল্‌লে, এরা আসামের আদিম অধিবাসী অহম্ জাতি। প্রকৃতি এদের তেমন হিংস্র নয়, তবে এরা এখনও তেমন সভ্যতার সংস্পর্শে আসেনি, তাই নিমকের মর্য্যাদা হারায় নি। এরা রাজেন বাবুদের বন্ধু; তাদের কাছে নিয়মিত সাহায্য পায়—তার বদলে এরা বন পাহারা দেয়, আর এ পথে যারা চলা-ফেরা করে, ধরে তাঁদের কাছে পৌঁছে দেয়। অনুনয়-বিনয়ের কথা ছেড়ে দে—লক্ষ টাকা ঘুসের লোভ দেখালেও নিমকহারামী এরা করবে না।

সমীরের কথা শুনে ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল। প্রাণপণে হাঁটতে লাগলুম। এত কষ্টের পর এদের হাতে আর কিছুতেই ধরা দেওয়া হবে না।

মনে মনে যখন এই সঙ্কল্প করেছিলুম, অদৃষ্ট-দেবতা তখন বোধ হয় অলক্ষ্যে বসে হাস্‌ছিলেন। গ্রাম ছাড়িয়ে এসে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করব, হঠাৎ কোথা হ'তে আমাদের চারদিকে কতকগুলো উদ্যত বর্শা এসে পথ রোধ করলে।

বিস্ময়ে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ে দেখি, প্রায় বিশ পঁচিশজন অহম্ আমাদের ঘিরে ফেলেছে।

ধরা দিতে মন বিদ্রোহী হ'য়ে উঠল; সমীরের কি মত জান্‌বার জন্যে তার দিকে তাকালুম।

সমীর আমাকে চুপ করে থাকতে ইসারা করলে।

এখন ভেবে দেখি, সমীর সেদিন বিশেষ অন্যায় করেনি। এ ছাড়া পথই বা কি ছিল? পঁচিশ জন লোকের সঙ্গে আমরা হু'টি প্রাণী কতক্ষণই বা যুঝতে পারতুম? ধরা সেই দিতে হ'তই—মাঝখান থেকে শুধু কিছু উপরি লাভ হ'ত—অযথা নির্য্যাতন।

স্থির হ'য়েই দাঁড়িয়ে রইলুম; তাদের মধ্যে একজন লোক—বোধ হয় সর্দ্দারই হবে, বাজখাঁই গলায় কি বলে উঠতেই দলের আর একজন লোক তার পাশে এসে দাঁড়াল।

সর্দ্দার তাকে আবার কি বল্‌তেই সে আমাদের দিকে ফিরে ভাঙ্গা বাংলায় বল্‌লে, তোমরা আস্‌ছ কোথা থেকে?

বুঝলুম, সর্দ্দার বাংলা জানে না, তাই এ লোকটা আমাদের দো-ভাষীর কাজ করবে।

তার কথার উত্তর দিলে সমীর; বল্‌লে, আমরা আসছি সদিয়া থেকে। বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছি।

সর্দ্দারের নির্দ্দেশমত সে আবার বল্‌লে, তোমাদের হাতের অস্ত্রগুলো মাটিতে ফেলে দাও।

সামান্য একখানা কাটারি—আত্মরক্ষার একমাত্র সম্পদ। সেটা হাতছাড়া করতে মন কিছুতেই চাইছিল না। কিন্তু সমীর ফেলে দিয়েছে দেখে, আমি আর দেরী করতে পারলুম

না, ফেলেই দিলুম। ন্যায়-অন্যায়, ভুল-ঠিক—যাই হোক না কেন, দু'জনে এক সঙ্গে তার ফল ভোগ করব; বিভিন্ন পথে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হ'তে পারব না কখনও।

আমরা কাটারিগুলো ফেলে দিতেই দো-ভাষীটা সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে গেল। তারপর সেগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখে গম্ভীর গলায় বল্‌লে, তোমরা মিথ্যে কথা বলছ। তোমরা সদিয়া থেকে আসনি, আসছ, রাজেন বাবুর বন থেকে পালিয়ে।

কথাটা বলেই সে আমার দিকে কটমট ক'রে তাকাল। আমি যে কি জবাব দোব—তা ঠিক করতে না পেরে ঘেমে উঠলুম।

এ বিপদ থেকে আমাকে উদ্ধার করলে সমীর। শান্ত স্বরে সে বল্‌লে, মিথ্যে মোটেই বলিনি—আমরা সদিয়া থেকেই আসছি।

লোকটা সমীরের কথা শুনে আমাদের কাছে এগিয়ে এল। তারপর কাটারির ওপর একটা চিহ্ন দেখিয়ে বল্‌লে, এ চিহ্ন রাজেন বাবুর। তোমরা এ কাটারি পেলে কোথা থেকে?

সমীর তবু দম্‌লো না; বল্‌লে, তুমি হয় ত ভুল করছ ভাই…

দো-ভাষীটা হঠাৎ ধম্‌কে উঠে বল্‌লে, থামো। তোমাদের আর কোন কথা শুনতে চাই না। তোমাদের এখুনি রাজেন

বাবুর কাছে নিয়ে যাব—যদি তিনি বলেন, তোমরা তাঁর লোক নও, তাহ'লে তোমাদের ছেড়ে দোব। এর জামিন্ আমাদের জাতির সুনাম। অহমেরা প্রাণ থাকতে সত্য ভঙ্গ করে না।—গর্ব্বে লোকটার মুখখানা চক্ চক্ করে উঠল।

মাথা হেঁট করে চল্‌লুম তাদের সঙ্গে। রাজেন বাবুর হাতে আবার গিয়ে পড়লে আমাদের যে কি অবস্থা হবে—তা যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। হায়! তার চেয়ে অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ এদের হাতে মরাও যে ঢের সুখের হ'ত!

বন্দী হয়ে আবার যখন রাজেন বাবুর কয়েদখানায় ফিরে এলুম, তখন রাত বোধ হয়, প্রথম প্রহর হবে। আমাদের উঠোনের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে তাদের একজন ওধারে চলে গেল—রাজেন বাবুকে যে ডাকতে—তা বুঝতে একটুও কষ্ট হ'ল না।

প্রায় মিনিট পাঁচেক বাদে আলো হাতে কতকগুলো লোকের সঙ্গে নীরদ বাবু এলেন। সেই স্বল্প অন্ধকারের মধ্যে দেখতে পেলুম—তাঁর চোখগুলো যেন রাগে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। দু'একটা কথার পর অহম্‌দের বিদায় দিয়ে নীরদ

বাবু আমাদের নিয়ে লোকগুলোর সঙ্গে এগোলেন—আমাদের আগেকার ঘরের দিকে নয়, কুলীদের ঘর ছাড়িয়ে-বনের দিকে।

খানিক চলার পর আমরা একটা কোঠা বাড়ীতে এলুম। সেই বাড়ীর নীচে একখানা অন্ধকার ঘরে আমাদের পুরে, দরজায় চাবি দিয়ে, নীরদ বাবু চলে গেলেন।

বুঝলুম, কাল আমাদের ভাগ্যে যা-ই তোলা থাক না কেন, অন্ততঃ আজ রাতের মত আমরা রেহাই পেলুম।

ঘরের মধ্যে এসে আমরা দু'জনে কেউ কারুর সঙ্গে একটা কথাও বলিনি। মেঝের উপর শুয়ে পড়লুম। এক সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা হাঁটবার পর ক্লান্ত শরীরে বেশীক্ষণ জেগে থাকতে পারলুম না—ঘুম এসে সমস্ত ভাবনা-চিন্তার হাত থেকে উদ্ধার করলে।

পরের দিন সকালে শঙ্কর এসে উপস্থিত হ'ল; তাকে দেখে খুসী হ'য়ে উঠল মনটা। আমাদের দু'টি মুড়ি খেতে দিয়ে সে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

দু'পুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বসে আছি। মনটা অত্যন্ত চঞ্চল। যে অপরাধ করেছি, তার শাস্তি পেতেই হবে জানি, কিন্তু ধৈর্য্য আর থাকৃছে না। মনে হচ্ছে, যত কঠোরই হ'ক না শাস্তির মাত্রা—সেটা শেষ হয়ে গেলেই বাঁচি। তার প্রতীক্ষায় বসে থাকৃতে থাকৃতে যে পাগল হ'য়ে যাব।

অবশেষে প্রতীক্ষা করার হাত থেকে মুক্তি পেলুম। দরজা খুলে শঙ্কর বল্‌লে, তোমরা বেরিয়ে এস।

বল্‌লুম, কোথায় শঙ্কর ?

শঙ্কর বল্‌লে, তোমাদের বিচার হবে রাজেন বাবুর কাছে।

শঙ্করের উত্তর শুনে লজ্জা পেলুম। এ প্রশ্ন কেন মুখ থেকে বেরুল ? আমাদের যে বিচার হবে, একথা ত একবারও ভুলিনি !

শঙ্করের পেছু পেছু সেই বাড়ীর আর একখানা ঘরে এলুম। ঘরখানা বেশ বড়। ঘরের এক ধারে ফরাস পাতা। তার ওপরে কতকগুলো লোক বসে আছে। সকলেই পরিচিত নয়; রাজেন বাবু, নীরদ বাবু আর ছুনিয়া সিং-কে কেবল চিন্‌তে পারলুম। বাকি যে পাঁচ ছ'জন রয়েছে, মনে হ'ল তারা সর্দ্দারের দল—এই বিচার-সভার জুরী।

আমরা শঙ্করের নির্দ্দেশ মত ফরাসের বিপরীত দিকে দেওয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। ছুনিয়া সিং-কে দেখে, হঠাৎ চম্‌কে উঠলুম। ও এখানে কেন ? ও-ত সর্দ্দার নয়— তবে ?

সন্দেহের মাঝে বেশীক্ষণ থাকৃতে হ'ল না। নীরদ বাবু গম্ভীর গলায় বল্‌লেন, সমীর, তুমি চক্রান্ত করে পালাতে চেষ্টা করেছিলে; শুধু তাই নয়, তপনকে পর্য্যন্ত ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলে। তার শাস্তি জান ?

সমীর জবাব দেবার আগেই আমি বলে উঠলুম, মিথ্যে কথা, আমার পালানোর জন্যে দায়ী আমি নিজে।

নীরদ বাবু ধমক দিয়ে উঠলেন ; চোপ্ রাও শুয়ার। তার-পর হাঁক দিয়ে বল্লেন, দরোয়ান, উস্‌কো পাঁচ কোড়া লাগাইয়ে।

দরোয়ান যেন প্রস্তুতই ছিল—হুকুম তামিল করতে অগ্রসর হ'ল।

সপাং করে এক ঘা চাবুক এসে পিঠে পড়ল। উঃ, কী সে যন্ত্রণা! দাঁতে দাঁত চেপে রইলুম। কোন রকম কাতরতা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে প্রকাশ পেতে দোব না। কিন্তু মুখে বোধ হয় যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠেছিল—কেন না, দ্বিতীয় বার চাবুক উঠতেই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সমীর দরোয়ানের উপর বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে, চাবুক কেড়ে নিলে।

ব্যাপারটা সকলের বোধগম্য হবার পূর্ব্বেই সমীর চাবুকটা বাগিয়ে ধরে এক পাশে সরে দাঁড়াল। ইচ্ছে, যে এগোবে, তার পিঠেই ওটা পরখ করবে।

এ রকমভাবে আপ্যায়িত হবার বোধ হয় কারও ইচ্ছে ছিল না, কারণ সকলে যে যেখানে ছিল, দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে দুনিয়া সিং এগোল সমীরের দিকে। কাছ বরাবর হ'তেই সমীর সজোরে চাবুক চালালে, কিন্তু আশ্চর্য্য-

ভাবে সে এড়িয়ে গেল। শুধু তাই নয়, আ..কা আক্রমণ করে সে সমীরকে মাটিতে ফেলে দিলে।

এর পর আর সমীরকে আয়ত্তে এনে তার হাত পা বেঁধে ফেলতে রাজেন বাবুর দলকে বিশেষ কষ্ট পেতে হ'ল না।

এইবার নীরদ বাবু সিংহনাদ করে উঠলেন। সমীরকে লক্ষ্য করে বল্‌লেন, তোমার বড় বিক্রম, না? চাবুকের চোটে শরীরের প্রত্যেকটি হাড় গুঁড়ো করে দিয়ে, তোমার বিক্রম শেষ করব। তারপর দরোয়ানকে লক্ষ্য করে বল্‌লেন, ওর বাকী চার ঘা হয়ে গেলে, এ উল্লুককে পঞ্চাশ ঘা বেত লাগাবি।

দণ্ডের মাত্রা শুনেই মাথার ভেতরটা ঝিম্ ঝিম্ করে উঠল। এক ঘা চাবুকের যন্ত্রণা আমার এখনও কাটেনি, পঞ্চাশ ঘা চাবুক খাবার পর সমীর কি বেঁচে থাক্‌বে?

এ সম্বন্ধে কোন কথা ভাব্‌বার আর সময় মিল্‌ল না। আমার দণ্ডের বাকী অংশটা আরম্ভ হ'য়ে গেল। দ্বিতীয় ঘা চাবুক প্রথমটার চেয়ে যন্ত্রণা-দায়ক বোধ হ'ল। তারপরে যন্ত্রণা বোধ হ'ল বটে, কিন্তু তেমন গুরুতর নয়। শরীরের অনুভব শক্তি বোধ হয়, তীব্র আঘাতে হঠাৎ অসাড় হ'য়ে পড়েছে।

আমার পালা শেষ হ'লে সমীরকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'ল—এবার তার পালা।

সপা সপাং করে চাবুক চল্‌লো—সমীর কিন্তু অটল। না করলে সে আর্তনাদ, না পড়ল তার মুখে বেদনার ছায়া। দেখে, বিস্ময়ে হতবাক্ হ'য়ে গেলুম।

তিরিশ ঘা চাবুক পড়বার পর সমীরের দেহ পড়ল এলিয়ে। অমন বলিষ্ঠ দেহ বার বার কেঁপে উঠল। তারপর এক সময় পা দু'টো থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে সমীর মাটির ওপর পড়ে গেল।

তারই উপর চল্‌ল—পিশাচদের তাণ্ডব লীলা। পঞ্চাশ ঘা যখন শেষ হ'ল—সমীরের দেহ তখন স্থির হ'য়ে গেছে।

শঙ্করের উপর আমাদের ব্যবস্থার ভার দিয়ে তারা চলে গেল।

আমি আর স্থির থাক্‌তে পারলুম না। সমীরের কাছে গিয়ে তার দেহ ধরে বার বার ঝাঁকুনি দিয়ে ডাক্‌লুম, সমীর, সমীর! না তার নিস্পন্দ দেহ একটু নড়ল—না পেলুম তার কাছ থেকে কোন সাড়া।

মনের দুর্বলতা প্রকাশ করব না বলে যে প্রতিজ্ঞা করে-ছিলুম, কোথায় গেল তা ভেসে। দু'চোখ দিয়ে হু হু করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

সমীরের নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখি, নিঃশ্বাস খুব মৃদুভাবে বইছে। ব্যগ্র কণ্ঠে বল্‌লুম, শঙ্কর, ভগবানের দোহাই,

যতই নিষ্ঠুর তুমি হও—তবুও তুমি মানুষ। একটু জল এনে দাও।

দেখি, আমার বলার অপেক্ষা শঙ্কর রাখে নি। এক গেলাস জল নিয়ে সে আসছে।

সমীরের হাতে, পায়ে, মুখে বেশ করে জল দিলুম। নিঃশ্বাসের বেগ তাতে একটু বাড়ল বটে, কিন্তু জ্ঞান এল না।

অসহায়ের মত শঙ্করের মুখের দিকে চাইলুম, কিন্তু ওর কাছে কি-ই বা আশা করতে পারি?

ভগবানের মহিমা বোঝা ভার। দুঃখ যাকে দেন, তাকে হয় দেন সহ্য করবার শক্তি, না হয় ভাগ করে ভোগ করবার দোসর। এ বিপদে শঙ্করই হ'ল আমার প্রধান সহায়।

ধরা পড়ে অবধি যে ঘরে আমরা আটক ছিলুম, শঙ্করের সাহায্যে সমীরকে আন্‌লুম সেই ঘরে তুলে। শুধু তাই নয়, সমীরের শোবার জন্যে কিছু খড়, একটা কলসী করে জল, আর একটা আলোও শঙ্কর কোথা থেকে এনে দিলে।

খড়ের বিছানায় সমীরকে শুইয়ে তার মাথার কাছে বসে আছি—চাবি খুলে আবার ঘরে এল শঙ্কর। আমার সাম্‌নে কিছু মুড়ি রেখে, অপর হাত থেকে নামাল একটা পাত্র। তাতে কি সব পাতা থেঁতো করা রয়েছে।

সমীরের মুখের দিকে একটু তাকিয়ে বল্‌লে, এই ছেঁচা

পাতা-গুলো ওর আহত-স্থানে লাগিয়ে দাও তপন, ব্যথা অনেক কমে যাবে। তোমার শরীরে যদি ব্যথা থাকে, তা হ'লেও লাগিও। আর এই সামান্য মুড়ি ক'টা খেয়ে ফেল।

আমাকে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে দেখে, একটু নীচু গলায় সে বললে, বিশ্বাস করবার মত কোন কাজ আজ পর্য্যন্ত আমি করিনি। তবুও আজ থেকে আমি তোমাদের বন্ধু—এ কথাটা বিশ্বাস কোর।

কথা শেষ ক'রেই শঙ্কর বেরিয়ে গেল। মুগ্ধ-বিস্ময়ে তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলুম। মনের মধ্যে বারে বারে এই কথাটাই তোলপাড় ক'রতে লাগল, শঙ্কর বন্ধু—এ সত্যি—না স্বপ্ন!

৭

রাত্রি গভীর হ'তে হ'তে ক্রমশঃ ভোরের দিকে গড়িয়ে চলে। সমীরের মাথার কাছে জেগে বসে থাকি। চোখে একটু তন্দ্রা এসেছিল, মনে হ'ল, কে যেন একটু জল চাইলে। চোখ মেলতেই দেখি, সমীরের জ্ঞান হ'য়েছে। বললুম, সমীর, জল খাবি?

ক্ষীণস্বরে সমীর বল্‌লে, হ্যাঁ, ভাই।

তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল নিয়ে তার মুখে ধরতেই সে ঘট্ ঘট্ ক'রে সবটা খেয়ে ফেল্‌লে। বল্‌লুম, সমীর, এখন একটু আরাম বোধ করছিস্?

একটু ম্লান হেসে সে উত্তর দিলে, হ্যাঁ, ভাই। কোন কষ্ট নেই, শুধু গায়ে অল্প ব্যথা।

একটা দুশ্চিন্তার বোঝা নেমে গিয়ে মনটাকে হাল্‌কা করে দিলে। যাক্, শঙ্করের ওষুধটা বেশ ফল দিয়েছে। নইলে, যাতনায় সমীর নিশ্চয়ই চীৎকার করত।

আবার যখন সমীরের দিকে চাইলুম, তখন সে গাঢ় নিদ্রিত। খুসী-মনে আমিও তার পাশে শুয়ে পড়লুম।

তিন দিন কেটে গেছে। খাওয়া আর ঘুমানো ছাড়া আর আমাদের কিছু করতে হয়নি। কষ্ট শুধু ঘরের মধ্যে বন্দী থাকার। আমাদের খাবার আনা আর প্রয়োজনীয় সব কাজ করে শঙ্কর। সে ছাড়া আর কাউকে এ তিনদিন আমাদের ঘরের ত্রি-সীমানায় দেখি নি।

সমীর বেশ সাম্‌লে উঠেছে। তাকে শঙ্করের সব কথা বলেছি। বিশ্বাস সে সম্পূর্ণ করেনি। সে জন্যে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। দুনিয়া সিং-এর দৃষ্টান্ত যে এখনও তার চোখের সামনে জ্বল্ জ্বল্ করছে। সমীরের পরামর্শ মত

শঙ্করের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে। এ সত্ত্বেও যদি সে আমাদের উপর ক্রুদ্ধ না হয়, তবে বোঝা যাবে, তার এ পরিবর্ত্তন আন্তরিক।

আমাদের ব্যবহারে শঙ্করকে দুঃখিত বই ক্রুদ্ধ বলে মনে হয় না।

সমীরের পরীক্ষা শেষ হ'ল। শঙ্কর পাশ করেছে, অর্থাৎ তার এ পরিবর্ত্তন মিথ্যা নয়।

সেদিন শঙ্কর আস্‌তে বল্‌লুম, শঙ্কর, আমাদের এ অবস্থায় আর কতদিন থাক্‌তে হবে ?

শঙ্কর বল্‌লে, কাল তোমাদের এখান থেকে যেতে হবে।

বল্‌লুম, কোথায় ?

শঙ্কর বল্‌লে, আমাদের প্রধানের কাছে। তোমাদের সম্বন্ধে কি করা হবে, তাঁর কাছে সে বিষয়ে আদেশ চাওয়া হয়েছিল, হুকুম এসেছে, সেখানে পাঠাবার। কালই তোমাদের যেতে হবে।

সমীর বল্‌লে, সে এখান হ'তে কতদূর ?

শঙ্কর বল্‌লে, ক্রোশ ছয় পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশের কাছাকাছি।

অনেক কিছু কথা শঙ্করকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হ'চ্ছিল, কিন্তু সাত-পাঁচ ভেবে চুপ করে রইলুম।

রাত্রে দু'জনের চোখে ঘুম এল না। আমাদের অদৃষ্টে
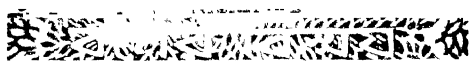
ভবিষ্যতে আরও কি জমা আছে—তাই আলোচনা করতে লাগলুম। কি করে, কতদিনে এর হাত থেকে মুক্তি পাব তা-ও।

কি কারণে বল্‌তে পারি না, মনটা সকাল থেকেই ভাল ছিল না। বেলা আটটা আন্দাজ শঙ্কর হাসি মুখে এসে হাজির। বল্‌লে, আমার সঙ্গে তোমাদের যাবার হুকুম হয়েছে। চট্‌পট্‌ তৈরী হ'য়ে নাও; দশটার মধ্যে বেরোতে হবে। তারপর গলাটা একটু খাটো করে বল্‌লে, সকলের সাম্‌নে আমার ব্যবহার মন্দ বলে ঠেকলেও তোমরা দুঃখ পেও না।

শঙ্কর আমাদের সঙ্গী হবে শুনে মনটা খুসী হ'ল; বুঝলুম, ভেতরে ভেতরে এই ভাবনাটাই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল।

সমীর বল্‌লে, শঙ্কর, তুমি নিশ্চিন্ত হও। আমাদের তৈরী হ'তে পাঁচ মিনিটের বেশী লাগবে না।

যাত্রার পূর্ব্বক্ষণে উঠোনে এসে দাঁড়ালুম। চারজন অহম্‌কে সঙ্গে নিয়ে শঙ্কর আসতেই, আবার কোন্ অজানা কূলের উদ্দেশ্যে যাত্রা সুরু হ'ল।

চারজন অহম্, শঙ্কর আর আমরা দু'জনে...

চারপাশে চারজন অহম, মাঝে আমরা তিনজন—এই রকম ভাবে পথ চলেছি। কোনদিকে চাইতে সাহস হয় না, পাছে এই বুনোগুলো ভাবে, আমরা পালাবার ফিকিরে আছি। তাতে হয় ত অকারণ জ্বালাতন ক'রে—প্রাণ অতিষ্ঠ ক'রে তুলবে।

অত্যন্ত গভীর বন। দিনের আলোর সেখানে প্রবেশাধিকার থাকলেও সূর্য্যদেবের ছিল না। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে একটু-আধটু আলো পড়ে—কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে!

বনের মধ্যে দিনের আলো কমে এসেছে—বোধ হয় এখন বিকেল। একটা ঝরণার ধারে এসে শঙ্কর বল্‌লে, এইখানে বসে একটু জিরিয়ে—কিছু খেয়ে নাও। তারপর একটুখানি গেলেই আজ রাত্রের মত বিশ্রাম।

আজ রাত্রে তাহ'লে প্রধানের আড্ডায় পৌঁছোব না!

খিদে সত্যিই পেয়েছে। অহম্মদের সঙ্গে যে কতকগুলো পুঁটলি আছে তা এতক্ষণ নজরে পড়েনি। তারই একটা খুলে, শঙ্কর সকলকেই অল্প অল্প মুড়ি দিলে। সেই মুড়িগুলো খেয়ে ঝরণার কাঁচের মত পরিষ্কার জল আঁজ্‌লা আঁজ্‌লা পান করলুম। দেহ যেন ঠাণ্ডা হ'ল।

ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীরটা একটু জুড়োতে না জুড়োতেই শঙ্কর হুকুম দিলে, উঠে পড় সব। আর দেরী করলে, পথের মধ্যেই সন্ধ্যা হ'য়ে যাবে।

শঙ্করের কথাটা ঠিক বুঝতে পারলুম না। তবে কি পথে আমরা কোন গ্রাম পাব?

এতক্ষণ যে পায়ে চলা পথ দিয়ে আমরা আস্‌ছিলুম, সন্ধ্যার মুখে সে পথ ছেড়ে ডান দিকে বেঁকলুম। অদূরে একখানা

কুঁড়ে। কুঁড়ের চারধারে অনেকখানি জায়গা জুড়ে শক্ত করে উঁচু বেড়া দেওয়া। বেড়া ঠেলে আমরা ঘরের সাম্‌নে এসে দাঁড়ালুম। বুঝলুম, এই ঘরেই আমাদের রাত্রিবাস করতে হবে।

ঘরখানি বেশ! ঘরের মধ্যে এসে আমরা দুজন পা ছড়িয়ে বসে পড়লুম। শঙ্কর রান্নার যোগাড় করতে লেগে গেল। অহমেরা রইল বাইরে। শুন্‌লুম, নিজেরাই তারা রান্না করবে। তারপর বাইরে আগুন জ্বেলে পাহারা দেবে। বুনো জন্তু ছাড়া বুনো লোকদের আক্রমণের ভয়ও নাকি আছে।

রান্না করে শঙ্কর ডাক দিলে খেতে। বাইরে আমরা খেতে এলুম। ওধারে অহমেরাও দেখলুম খেতে বসেছে। সারাদিনের পর এই সামান্য খাদ্যও যথেষ্ট তৃপ্তি দিলে।

শুতে যাবার পূর্ব্বে শঙ্কর আর একবার অহমদের সাবধানে থাকতে বলে দিলে। তারপর ঘরে এসে দরজায় দিলে খিল; বল্‌লে, এ বনের মধ্যে বিপদ যে কোথা হ'তে আসে কিছুই বলা যায় না। তবু সাবধানে থাকা ভাল।

তিনটে বাঁশের মাচায় তিনজনে শুয়ে পড়লুম। একটু আগেই ক্লান্তিতে দেহ ভেঙ্গে পড়ছিল—এখন আর তার লেশমাত্র চিহ্ন নেই।

শয়তান রাজেন বাবুর কবলে পড়ার পর—আজ এই প্রথম

মনে শান্তি পেলুম। সত্যি—কি মনোরম এই অরণ্যের নীরবতা। এ প্রাণকে শঙ্কিত করে তোলে না—তাকে ছুঁয়ে আনন্দের দোলা দিয়ে যায়। মনে হচ্ছে, যেন তিন বন্ধুতে বনভোজনে এসেছি।

হঠাৎ একটা কথা মনে হ'তেই বল্লুম, শঙ্কর, তোমরা এই বাঁশের মাচায় শোও কেন? এর চেয়ে মাটিতে খড় বিছিয়ে শোওয়া ত ঢের আরামের।

শঙ্কর বল্লে, এখানে বড় সাপের উপদ্রব—তাই বাঁশের মাচায় শোওয়া। তারপর একটু কুণ্ঠিতস্বরে সে বল্লে, একটা কথা বলব কিছু মনে করবে না, সমীর বাবু।

তার কুণ্ঠা দেখে আমার মত সমীরও বোধ হয় আশ্চর্য্য হ'য়ে গিয়েছিল। ধীর স্বরে সমীর বল্লে, তুমি কিন্তু হচ্ছ কেন শঙ্কর—তোমার যা ইচ্ছে জিজ্ঞাসা কর; রাগ আমরা একটুও করব না।

শঙ্কর বল্লে, তোমাদের বাড়ীর কথা—রাজেন বাবু কি করে তোমাদের যোগাড় করলেন, সে কথা শুন্তে বড় ইচ্ছে হয়।

সমীর বল্লে, এই! এ বলতে আর কি আপত্তি থাকতে পারে? তপন, বল্ত ভাই।

তিন জনে যে যার মাচার উপর উঠে বস্লুম। ঘরের

মধ্যে একটা মিটমিটে আলো জ্বল্‌ছে। তারি আলো-অন্ধকার একটা যেন গোপন রহস্য সৃষ্টি করছে। আমি সুরু করলুম, আমাদের কাহিনী। বল্‌লুম, রাজেন বাবুর শঠতার কথা; বল্‌লুম, দুঃখিনী মায়ের অবস্থা; বল্‌লুম, অত্যাচারে আমার দুর্দ্দান্ত কাকার বাড়ী ছেড়ে পালানো। মা তাঁকে ছেলের মত মানুষ করেছিলেন—তাঁর খোঁজ খবর না পেয়ে মা মৃতপ্রায়; আমার সংবাদ না পেলে হয় ত মা আর বাঁচবে না।

কাহিনী শেষ করে—শঙ্করের দিকে ফিরতেই দেখি, শঙ্করের চোখের কোণে জল চক্ চক্ করছে।

শঙ্করের চোখে জল! বিস্ময়ে নির্ব্বাক হ'য়ে গেলুম।

সমীরের ডাকে ঘুম ভাঙ্গতেই দেখি, বেশ বেলা হ'য়ে গেছে। রাত্রিটা কি করে কেটেছে জানি না। তবে বোধ হয়, কোন রকম গোলমাল হয় নি।

মুখ-হাত ধুয়ে কিছু খাওয়া-দাওয়ার পর আবার যাত্রা হ'ল সুরু। এবার পথ না কি আর বেশী নেই; বেলা বারটার মধ্যেই পৌঁছে যাব।

ঘড়িতে কটা বাজল জানি না, তবে এক সময় আমাদের পথ-চলার শেষ হ'ল—আমরা গন্তব্য স্থানে এসে পৌঁছলুম।

পূর্ব্বেকার বনের সঙ্গে এর বিশেষ কোন তফাৎ আছে বলে মনে হয় না।

এখানেও আমরা আশ্রয় পেলুম সেই রকম একখানা ছেঁচা-বেড়ার মধ্যে, তবে হারালুম শঙ্করকে।

দিনের মধ্যে হয় ত একবার শঙ্করের সঙ্গে দেখা হয়—তাও ক্ষণেকের জন্যে।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় প্রধানের আদেশ মত আমরা চল্‌লুম—তাঁর উদ্দেশ্যে। মনের মধ্যে সাহস সঞ্চার করতে চেষ্টা করলেও সাহস পেলুম না। বুক দুরু দুরু কাঁপতে লাগল। অ-প্রধানদের কাছে যে অভ্যর্থনা পেয়েছি, প্রধানের কাছে তার কতগুণ লাভ করব—এই হ'ল মস্ত একটা চিন্তা।

প্রধানের ঘরের কাছে এসে পা আর চল্‌তে চায় না—তবুও চল্‌তে হ'ল। ঘর নির্জ্জন। দু'টো তেলের প্রদীপের উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত। ফরাসের ওপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় প্রধান শুয়ে আছেন। প্রধানের মুখের দিকে চাইতেই আমি যা কল্পনা করেছিলুম, সবই যেন ওলোট-পালোট হ'য়ে গেল।

পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত সুডৌল একখানি মুখ। যেমন দীর্ঘ ঋজু দেহ, তেমনি সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন নিখুঁত সুন্দর। প্রতিভায় উজ্জ্বল দু'টি চোখ—তাতে যেন নীল আকাশের গাঢ় রহস্য। চাইলে, হঠাৎ চমক লাগে, ভয় হয় না।

আমরা ঘরের মাঝখানে দাঁড়াতেই প্রধান আমাদের দিকে একবার মুখ তুলে তাকালেন—সে দৃষ্টি কি তীব্র! মনে হ'ল যেন আমাদের মনের গোপন কোণ পর্য্যন্ত পৌঁছল; কিন্তু ঐ ক্ষণেকের দেখাতেই—তাঁর মুখের উপর যে বেদনার ছায়া পড়েছিল তা আমার দৃষ্টি এড়াল না—কিসের এ দ্বন্দ্ব ?

পরক্ষণেই মনে হ'ল, সৎ হ'ক আর অসৎ-ই হ'ক এত বড় একটা প্রতিষ্ঠানের গুরুভার দায়িত্ব যাঁর মাথায়—মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তাকে মন থেকে নির্ব্বাসিত করবার সময় তাঁর কোথা ?

প্রধান প্রশ্ন ক'রলেন—কোথায় আমাদের বাড়ী, আমাদের পিতৃ-পরিচয় প্রভৃতি সামান্য গুটিকত কথা।

কি গম্ভীর সে স্বর! সে স্বর এবং দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে বোধ হয় শয়তানেরও মিথ্যে কথা বলতে মুখে বেধে যায়—আমরা ত কোন ছার! সাধ্যমত সকল প্রশ্নেরই সত্যি উত্তর দিলুম।

আমার কথা শেষ হ'লে প্রধান শঙ্করের দিকে চেয়ে হাত-খানা মৃদু নাড়লেন।

শঙ্কর ইঙ্গিতে আমাদের তাকে অনুসরণ করতে বলে এগোল। বুঝলুম, আমাদের পরীক্ষা শেষ হ'য়েছে। এ রকম পরীক্ষা আমরা দিনে যতবার বলবে দিতে পারি।

কি পার্থক্য এই প্রধান ও অপ্রধানদের মধ্যে। লোকে
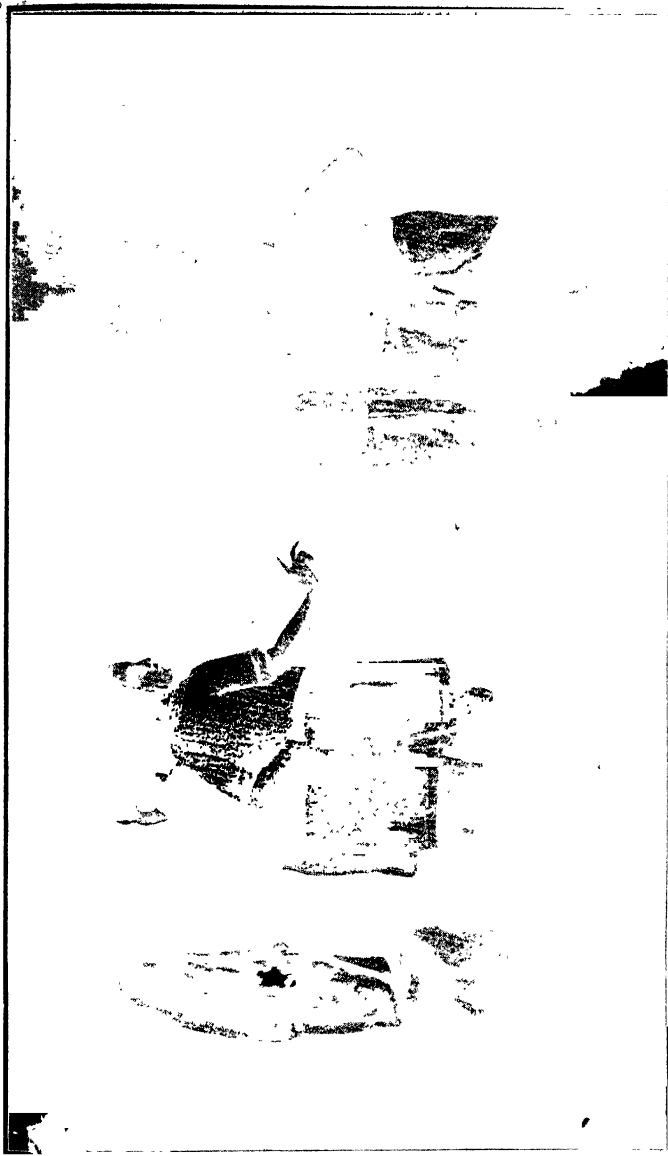
মাঝির প্রতিজ্ঞা কিন্তু ভীষ্মের মত অটল। কোন কিছুই তাকে সঙ্কল্প থেকে টলাতে পারল না।—৯৩ পৃঃ।

বলে সূর্য্যের তাপ সহ্য হয়; কিন্তু সেই তাপে তপ্ত যে বালি—তার উত্তাপ অসহ্য। কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্যি।

আমাদের সম্বন্ধে কি আদেশ হ'ল জানবার জন্যে মন ছট্‌ফট্ করতে লাগল। ছেড়ে দেবে এ আশা করি না—তবে শাস্তি যদি আবার পেতেই হয়, তার স্বরূপটা আগে থেকে জানা থাক্‌লে প্রস্তুত হ'য়ে থাকতে পারি—শাস্তির দুঃখ তাতে বরং একটু লাঘব হয়।

শঙ্করকে কাছে পেয়ে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলুম, কিন্তু সে-ও কোন আভাস দিতে পারেনি। ব্যস্ত হ'য়ে কোন লাভ নেই জেনে, নিশ্চিন্ত মনে খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দোব ঠিক করলুম। এভাবে যে কটা দিন কাটে—তাতে লাভ বই লোকসান দেখি না।

সেদিন শঙ্করের সঙ্গে অপর একটি লোক আমাদের ঘরে শুভাগমন করলেন। পরিচয় জানা না থাকলেও অভ্যর্থনা করতে ত্রুটি করলুম না। হিন্দু আমরা—এটা বেশ জানি যে, তেত্রিশ কোটী দেবতাদের মধ্যে সকলের ভাল করবার ক্ষমতা না থাক, মন্দ করতে পারেন ষোল আনা। সুতরাং উপেক্ষা কাউকেই করা চল্‌বে না।

লোকটি বল্‌লে, তোমরা লেখাপড়ার কাজ ভাল জান?

তার কথা শুনে হাসি এল। আমার উত্তর দিতে দেরী

দেখে, সমীর বল্‌লে, কাজ জানি না বটে, তবে লেখাপড়া কিছু কিছু জানি।

সমীরের এই ঠাট্টাতে আবার কি ফ্যাসাদ বেধে ওঠে ভেবে ভয় পেয়ে গেলুম, কিন্তু কথাটা গায়ে না মেখে সে বল্‌লে, তা হ'লেই হ'ল। ও একই কথা।

এক হ'ক, আর নাই হ'ক—আমার কিন্তু বিস্ময়ের আর অন্ত রইল না। প্রতিঘাত করবার ক্ষমতা থাকতে কেউ যে এরকম ভাবে ক্ষমা করতে পারে, এর আগে আর দেখিনি কখন।

লোকটা বল্‌লে, বেশ, তোমরা কাঠ-চালানি কুলীদের কাজের হিসেব রাখবে—তোমাদের ওপর প্রধানের এই আদেশ হয়েছে। এখন চল, খাতাপত্তর সব বুঝিয়ে দি।

আর গাছ কোপাতে হবে না—এই ভেবে মন আনন্দে নেচে উঠল। একটিও কথা না বলে, লোকটার পিছু পিছু চল্‌লুম।

কাজ-কর্ম্ম বুঝে নিতে আমাদের বিশেষ কষ্ট হ'ল না। সাধারণ হিসাবের ভার পড়ল আমার উপর—সমীর পেল কুলীদের কাজের হিসাব রাখার ভার।

কাজ সহজ হ'য়ে গেল, এ আনন্দে আমাদের উদ্দেশ্য ভুল্‌লুম না। কাজ-কর্ম্ম করি—যারা আলাপ করতে আসে

হাসিমুখে তাদের সঙ্গে কথা বলি—দৈনিক যতটা কাজ হওয়া উচিত তার কম হ'লে সর্দ্দারদের ধমক দি। প্রত্যেক পদে দেখাতে চাই—আমরা এখানকার সঙ্গে বেশ মিশে গেছি—আমাদের মন গেছে এখানে বসে।

কর্ত্তৃত্বের বোধ হয় একটা মোহ আছে, নইলে সর্দ্দারদের ধমক দিলে মন খুসী হয়ে ওঠে কেন ?

এখানে আর সব বিষয়ে সুবিধা হ'লেও একটা অসুবিধা থেকে গেছে, সেটা স্বপাক আহার।

কিন্তু এ নিয়ে দুঃখ করা ভুল ; জগতে সকল বিষয়ে সুখী মানুষ ক'টা আছে ?

এখানে এসে পর্য্যন্ত চিন্তা করা ছাড়া—পালাবার আর কোন সুবিধা করে উঠতে পারি নি। ক্ষমতা হাতে পেয়ে প্রথমটা বুঝতে পারি নি যে, এই ক্ষমতাই একদিন আমাদের এমন করে বিপন্ন করবে।

আমাদের রুদ্রমূর্ত্তি দেখে সর্দ্দারগুলো ভয় করা চ আরম্ভ করেছে। সুতরাং আলাপ করে যে এদের কাছ থে ক বনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা জেনে নোব, তার উপায় আর রা ; নি,।

আরও বিপদে পড়েছি, শঙ্করকে নিয়ে। তার সঙ্গে তার দেখা হয় না—সে এখানে আছে, না রাজেন বাবুর দলে ফিরে গেছে, তা জানি না। তার উপর রাগ হয়। ভাল করে ভেবে

দেখলে কিন্তু রাগের কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। সে আর আমাদের উপর অত্যাচার করবে না—আমাদের বন্ধু হবে বলেছিল। তার কথার নড়চড় ত হয় নি। যাদের নিমক সে এতদিন খেয়ে এসেছে, তাদের সঙ্গে নিমকহারামী করে, সে আমাদের মুক্ত করে দেবে—এ আশ্বাস সে ত ইঙ্গিতেও আমাদের দেয় নি!

যত দিন যাচ্ছে, মনে মনে ততই যেন হতাশ হচ্ছি। রাত্রে, সারাদিনের কর্ম্ম-কোলাহলের অবসানের পর, যখন বিছানার ওপর এলিয়ে পড়ি, তখন ছাড়া-পাওয়া মনটা আত্মীয়-স্বজনের কাছে ঘুরে বেড়ায়। মনে পড়ে, আমার সেই শৈশব-স্মৃতি মাখা জন্মভূমিকে আর বিদায় কালের অশ্রুমুখী আমার মাকে!

এম্‌নি করে দিনের পর দিন কাটে; ক্রমে মাসও গড়িয়ে যায়। হিসাব করে দেখি, বাড়ী ছেড়ে বেরিয়েছি আজ প্রায় আড়াই মাস।

নিষ্ফল আশা মনের মধ্যে পোষণ করে মুক্তি পাওয়া সম্বন্ধে যখন প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছি, তখন একটি ঘটনা আমাদের মৃত-দেহে যেন প্রাণ এনে দিলে।

সেদিন কোন্ শুভক্ষণে রাত পুইয়েছিল জানি না। তার কথা জীবনে কোনদিন ভোলবার নয়। দিনশেষে এসেছি আমাদের কুটীরে ফিরে। একটু বিশ্রামের পর রান্নার যোগাড়

দেখবার জন্যে উঠলুম। ঘরের যেধারে চাল-ডাল রাখা ছিল, সেখানে গিয়ে দু'টো চক্‌চকে কি জিনিষের উপর লক্ষ্য পড়ল। ভাল করে পরীক্ষা করে আনন্দে মনটা উঠল ভরে। ডাক দিলুম, সমীর, শিগ্‌গীর আয়—

কথার মধ্যে যে ব্যস্ততার সুর ফুটে উঠেছিল, তা শুনে সমীর দৌড়ে এল ; বল্‌লে, কি হয়েছে তপন ?

চক্‌চকে জিনিষ দু'টো আর কিছু নয়—দু'খানা প্রকাণ্ড ছুরি—আঙ্গুল দিয়ে সমীরকে তা-ই দেখিয়ে দিলুম।

ছুরিগুলো পরীক্ষা করে সমীর বল্‌লে, বেশ ভারী আর ধারালো ; এক এক ঘায়ে এক একটা লোককে দু' টুক্‌রো না করা যাক্—ভীষণভাবে জখম করা যাবে। আয়, তপন, এগুলো লুকিয়ে ফেলা যাক্—ভগবান যখন পাইয়েই দিয়েছেন।

বল্‌লুম, কিন্তু কেউ যদি রেখে গিয়ে থাকে—ফিরে এসে না পায়···

আমার কথায় বাধা দিয়ে সমীর বল্‌লে, না পায় ব'য়ে গেল। আমরা তার কি জানি ? এ সুযোগ হাতে পেয়ে কখনই ছাড়া যেতে পারে না। এ দু'টো লুকোতেই হবে।

কিন্তু লুকোবার মত জায়গা এ ঘরের মধ্যে কোথায় ?

সম্ভব এবং অসম্ভব অনেক আলোচনার পর ঠিক হ'ল, ঘরের আড়ার উপর ওগুলো রাখা হবে। ঠিক তো হ'ল, কিন্তু

কাজে তা কি করে পরিণত করা যায় ? ঐ উঁচু আড়ার নাগাল পাওয়া যাবে কি করে ?

যা হ'ক, উপায় একটা মিল্‌লো। আমার কাঁধের ওপর চড়ে সমীর আড়ায় উঠে পড়ল। তারপর সে ছুরি দু'টো ভাল করে লুকিয়ে রেখে নেমে এল।

কোন পথ খুঁজে না পেয়ে মনের যে ইচ্ছা গোপনে সমাধি লাভ করছিল, আজ এই সামান্য একটু সম্ভাবনার স্পর্শে এসে তা আবার সচেতন হ'য়ে উঠল। এখন আমাদের একমাত্র চিন্তা হ'ল, একটু পথের সন্ধান কি করে পাওয়া যায়···

চিন্তামাত্রই সার হ'ল। পথের সন্ধান আর মিল্‌লো না। ব্যর্থ সন্ধানে কাটতে লাগল দিনের পর দিন।

ভগবান্ কখন যে কি রকম ভাবে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন, তা মানুষের বুদ্ধির অগোচর। নইলে, যার চিন্তায় দিনরাত্রি চোখে ঘুম ছিল না—সেটা যে এমন সহসা, এমন অযাচিতভাবে আমাদের হাতে এসে পড়বে, তা ভাবতেও পারি নি।

সেই কথাটাই এখন বলি। সেদিন কাজের ফাঁকে দপ্তর-খানার কতকগুলো কাগজ-পত্র নাড়াচাড়া করছিলুম। হঠাৎ তার মধ্যে একখানা ছক্-কাটা কাগজ দেখতে পেলুম। কৌতূহলী হয়ে সেখানা নিলুম টেনে। পথের একখানা নক্সা। হাতটা কেঁপে উঠল; দুরু দুরু করতে লাগল বুকটা। সেটা

যে কোন্ পথের নক্সা—তা দেখবার আর সাহস হ'ল না। কি জানি, যদি কেউ এসে পড়ে? যদি কেউ দেখতে পায়? তাড়াতাড়ি কাগজটা ভাঁজ করে ট্যাকে গুঁজে নিলুম। সমীরকে পর্য্যন্ত তখন কোন কথা বল্‌তে সাহস হ'ল না।

এর পর আর আমার সেখানে বসে থাকা অসম্ভব হ'য়ে উঠল। ভয়ে, উত্তেজনায় কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল।

ঘরে ফিরে এসেও সমীরকে কিছু জানালুম না। খাওয়া-দাওয়ার পর দু'জনে শুয়ে পড়লুম। ক্রমে চারধারের কল-কোলাহল নীরব হয়ে গেল।

ধীরে ধীরে ডাক্‌লুম, সমীর!

সমীর তখনো ঘুমোয় নি। বল্‌লে, কি রে?

বল্‌লুম, আলোটা জ্বেলে নিয়ে একবার এখানে আয় ত ভাই।

আলো নিয়ে সমীর এসে হাজির হ'তেই তার চোখের সাম্‌নে সেই কাগজখানা মেলে ধরলুম।

কাগজটা একবার ভালো করে দেখে নিয়ে সমীর উৎসাহ ভরে বল্‌লে, কোথায় পেলি এটা?

পেয়েছি কোথায় সমীরকে বল্‌লুম।

সমীর বল্‌লে, তপন, এইবার বুঝি আমাদের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

আশায়-আনন্দে মনটা দুলে উঠল। মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না।

সমীর বল্‌তে লাগল, কাগজের উপর দু'টো পথের উল্লেখ রয়েছে। একটা গিয়েছে, রাজেন বাবু যে বনে আছেন সেইখানে —অপরটা গিয়ে পোঁছেচে শিলচরে।

সে রাত্রে ঠিক হ'য়ে গেল—পরের দিন আমরা শিলচরের দিকে যাত্রা করব।

পরদিন প্রভাত যেন এক নূতন বার্ত্তা নিয়ে হাজির হ'ল। আজকে সব কিছুরই রং যেন গেছে বদলে। আকাশ-বাতাসে যেন মুক্তির আনন্দের আভাস পাচ্ছি।

আজ যেন কিছুতেই মন বসে না। কোন কিছু অন্যায়ই যেন চোখে পড়ে না। আসন্ন মুক্তির আনন্দ যেন তাদের সমস্ত দোষ হরণ করেছে। তাই—যে ত্রুটির জন্যে অন্যদিন সর্দ্দারদের বকেছি—আজ সেগুলো ত্রুটি বলেই মনে হ'ল না।

সন্ধ্যা যত এগিয়ে আসতে লাগল, একটি দু'টি করে সন্ধ্যা-তারা যতই ফুটে উঠতে লাগল আকাশের গায়ে, মন ততই চঞ্চল হ'য়ে উঠতে লাগল। যাত্রা করবার অধীরতা তার মধ্যে ছিল বটে, কিন্তু তার চেয়ে ছিল সাফল্যের সন্দেহ। কেবলি মনে হচ্ছিল, যদি আবার ধরা পড়ি...

৮

সময় কারও জন্যে অপেক্ষা করে না। সমীরের হিসাব মত আমাদের যাত্রার ক্ষণও এক সময় এসে গেল। পথের দেবতাকে স্মরণ করে অগ্রসর হ'লুম।

মনকে প্রবোধ দিলুম, চেষ্টা করতে হবে ; ফলাফল যাই হ'ক না কেন।

চলেছি, ত চলেইছি ; পথ একে অচেনা, তায় গভীর বন। সুতরাং গতি মন্থর। প্রতি পদক্ষেপেই শঙ্কিত হ'য়ে উঠি ; উৎকর্ণ হ'য়ে বনের প্রতিটি শব্দ শুনতে চেষ্টা করি।

আকাশে একফালি চাঁদ উঠেছে। তারি আলোয় যেন দূরে কতকগুলো কুঁড়ে দেখতে পেলুম। ভয়ে আর পা চলে না।

সমীরও দেখলুম, বেশ, চিন্তিত হ'য়ে পড়েছে। পরামর্শমত ঠিক করলুম, আর এগোন হবে না। এখানেই লুকিয়ে থাক্‌ব, তাতে বরাতে যা-ই হ'ক। জেনে শুনে ও বুনোদের হাতে আর ধরা দোব না।

'নিবিড় বন'—একথাটা অপরিচিত নয় ; লোকের মুখে শুনেছি, ছাপার হরফে পড়েছিও, কিন্তু সে সম্বন্ধে মনে মনে যা ধারণা করে রেখেছিলুম, তা লোককে বলা চলে না। আমাদের চলার পথের একটু দূরে একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ

ছিল। ঠিক্ হ'ল, তারই ঘন পাতার অন্তরালে আশ্রয় নোব। তারপরে বনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা দিনের আলোয় বেশ ভালো করে দেখে, তবে আবার অগ্রসর হওয়া।

দু'জনে গাছে উঠে একটা শক্ত মোটা ডালে আশ্রয় নিলুম। বসে বসে বোধ হয় একটু তন্দ্রা এসেছিল, হঠাৎ একটা বিকট চীৎকারে ঘুম ভেঙ্গে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠল—চারদিক থেকে বিচিত্র গর্জ্জন। বুঝলুম, বনে জাগরণের সাড়া পড়েছে।

রাত্রিটা জাগরণে হ'ক—নির্ব্বিঘ্নেই কাটল।

প্রভাত হবার সঙ্গে সঙ্গেই স্বচ্ছন্দতা ফিরে এল। মনে পেলুম সাহস। রাত্রির একটা বিভীষিকা আছে। তার অন্ধকার চির রহস্যাবৃত। তার মধ্যে কি যে লুকানো আছে, তা মানুষের বুদ্ধির অগম্য। কেউ তা এ পর্য্যন্ত ভেদ করতে পারে নি।

দিনের আলো ক্রমেই বাড়ছে। এখন আমরা চারধার বেশ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু বনের মধ্যে জন-প্রাণীর সন্ধান নেই। কাল রাতে যে কুঁড়েগুলো আমাদের গতিরোধ করেছিল, তাদের দিকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখলুম।

এতক্ষণে সকলেই জেগে উঠেছে এবং আমাদের পালানোর সংবাদও বোধ হয় জানাজানি হ'য়ে গেছে। তারা কখন নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে নেই—আমাদের খোঁজে চারধারে লোক পাঠিয়েছে। তাই ঠিক করলুম, এ বেলার মত এই গাছে বসেই

কাটান হবে, তারপর যদি সন্দেহজনক কিছু না ঘটে, তবে সন্ধ্যার আগে আর একটু অগ্রসর হব।

গাছের উপর বসে আছি। অনেক দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি যাচ্ছে, কিন্তু ভয় পাবার মত কিছুই দেখতে পাই না।

ক্রমে সূর্য্য উঠল মাথার উপরে। তৃষ্ণায় গলা কাঠ হয়ে গেছে। বল্‌লুম, সমীর, ঐ ত একটা নদী দেখা যাচ্ছে, ওখান থেকে হাত মুখ ধুয়ে একটু জল খেয়ে আসি।

একটু ভেবে সমীর বল্‌লে, আ, যা। কিন্তু ছুরিখানা সঙ্গে নে।

জল খেয়ে ফিরে আসতে বোধ হয় মিনিট কুড়ি লেগেছিল। গাছে উঠে দেখি, সমীর নেই। ভয়ে বুকের ধুক্‌ধুকুনি যেন থেমে গেল। সমীর গেল কোথায়? নদীতে সে যায় নি। তা হ'লে ত দেখতে পেতুম তাকে।

কি যে করব, কিছুই ঠিক করতে পারলুম না। শরীরে এমন শক্তি নেই যে, নেমে গিয়ে এধার ওধার একটু সন্ধান নিই। অচেতনের মত সেইখানে বসে রইলুম।

কতক্ষণ যে ওই রকম ভাবে কেটেছে, জানি না। হঠাৎ পেছন থেকে কে আমার পিঠে হাত দিতেই চম্‌কে ফিরে চাইলুম, দেখি, হাতে কতকগুলো ফল নিয়ে সমীর দাঁড়িয়ে।

আমাকে চম্‌কাতে দেখে, সমীর একটু হেসে উঠে বল্‌লে, এমন তন্ময় হ'য়ে কি ভাব্‌ছিলি রে?

এতক্ষণ সমীরকে না দেখতে পেয়ে মনে যে ভয় হয়েছিল, তাকে দেখবামাত্রই তা রাগে পরিণত হ'ল। বিশেষ তার হাসি দেখে জ্বলে উঠে বল্‌লুম, হাসতে তোর লজ্জা করে না? কোন কথা না বলে গিয়েছিলি কোথায়?

আমার রাগ থামাবার জন্যে সমীর বল্‌লে, সত্যি এটা আমার অন্যায় হ'য়ে গেছে—রাগ করিস্ নি। একটা ভারি সুখবর আছে।

মনটা ঠাণ্ডা হ'ল। বল্‌লুম, সুখবর কি শুনি? গিয়েছিলি কোথায়? এ সব ফলই বা কোথায় পেলি?

সমীর বল্‌লে, বাস্‌রে! একসঙ্গে তুই এতগুলো প্রশ্ন করলি যে, কোনটার জবাব আগে দি, তা-ই ভেবে পাচ্ছি না।

আজ তিন মাসের মধ্যে সমীরকে এত খুসী কখন দেখি নি; বল্‌লুম, তোর সুখবরটাই আগে শোনা। বাকিগুলো না শুনলেও ক্ষতি হবে না।

সমীর বল্‌লে, তুই ত গেলি জল খেতে। ঐ কুঁড়েগুলোর দিকে চেয়ে বসেছিলুম। সকাল থেকেই লক্ষ্য করছি, কিন্তু জন-প্রাণীকে ও-র ত্রি-সীমানায় তখনও যেমন দেখতে পাই নি, এখনও পেলুম না। হঠাৎ মনে হ'ল, চুপিসাড়ে একবার ও গুলোর কাছে গিয়ে খোঁজ নিয়ে এলে হয় না? সত্যি ওখানে লোক আছে, না আমার ধারণা মত ও-গুলো পরিত্যক্ত।

যেমন কথাটা মনে হওয়া, অমনি নেমে পড়লুম। তোর ফেরা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে ইচ্ছা সত্ত্বেও পারলুম না। অতি সন্তর্পণে ওখানে গিয়ে পৌঁছলুম। গিয়ে দেখি, যা ভেবেছিলুম, ঠিক তাই। কোন লোক ওখানে বাস করে না। নির্ভয় হ'য়ে তখন কুঁড়েগুলোর মধ্যে গেলুম। সবশুদ্ধ দশখানা ঘর। দেখে মনে হ'ল, অন্ততঃ বছর দুই ওদের একটারও মধ্যে লোক বাস করে নি। না করুক, তাতে দুঃখ আমাদের নেই। কিন্তু ওরা একদিন ওখানে বাসা বেঁধে আমাদের কিছু সুবিধা করে গেছে। চারধার যে ফলের গাছ পুঁতেছিল, তা ত আর সঙ্গে নিয়ে যায় নি। সেই গাছগুলো থেকেই তাড়াতাড়ি এগুলো পেড়ে আনছি। যাবার পথে আরও কিছু পেড়ে নিয়ে ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চয় করে রাখতে হবে।

মনের ওপর থেকে একটা গুরুভার নেমে গেল। উল্লসিত হ'য়ে বললুম, তা হ'লে আমাদের পথ চলতে উপস্থিত আর কোন বাধা নেই ত?

সমীর বললে, না। আয়, এগুলো খেয়ে নিয়ে যাত্রা সুরু করা যাক্।

যা পারলুম, দু'জনে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে নেমে পড়লুম।

অস্তমান সূর্য্যের গোধূলি-আভায় যখন আকাশ ও পৃথিবী রাঙা হ'য়ে উঠেছে, তখন আমরা একটা রাস্তার ধারে এসে

পৌঁছলুম। রাস্তাটা প্রায় পঁচিশ ফুট চওড়া—বনের বুক চিরে কোন্ সুদূরে গিয়ে মিলেছে, কে জানে?

রাস্তার ওপারে আবার বন। এটা পেরিয়ে আবার আমাদের বনের মধ্যেই ঢুকতে হবে।

হঠাৎ দেখি, আমাদের কিছু দূরে রাস্তার উপর এক সাহেব ঘোড়ায় চড়ে আসছে। সঙ্গে তার দু'জন চাপরাসি।

বুঝলুম, নিকটেই কোন চা-বাগান আছে। সাহেব সেখানকার বড় বা ছোট কর্ত্তা হবে।

সাহেব চলে গেলে রাস্তা পার হবো ঠিক করে, একটা গাছ-তলায় এসে দাঁড়ালুম।

আমাদের দেখে সাহেব হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। কাছে এসে একবার দু'জনের আপাদ-মস্তকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে। তারপর ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় প্রশ্ন করলে, তোমরা কে? কোথায় যাবে?

নিজেদের হীন কাপড়-চোপড়ের দিকে চেয়ে, মুখ দিয়ে আর ইংরাজি কথা বেরুল না। বল্‌লুম, আমরা সদিয়ায় বাস করি, শিলচরে যাব।

আমাদের কথা শুনে সাহেব ধমক দিয়ে বল্‌লে, মিথ্যে কথা। তোমরা চা-বাগানের কুলী।

সাহেবের কথা শুনেই তার উদ্দেশ্য বুঝতে দেরী হ'ল না।

ভয়ে গেল বুক উড়ে। বল্‌লুম, আমাদের বিশ্বাস কর, সাহেব, কোন চা-বাগানে আমরা কাজ করি না।

সাহেব আমাদের কথায় কর্ণপাতও করলে না। ইঙ্গিতে চাপরাসি দু'টোকে ডেকে বল্‌লে, এদের ধরে নিয়ে আয়।

কোনরকম বাধা দিতে গেলে সাহেবের হাতের ঐ চাবুক যে পিঠে পড়বে, তা বুঝতে কষ্ট হ'ল না। তাই অত্যন্ত বাধ্য ছেলের মত তাদের সঙ্গে এগোলুম।

আমাদের অনুমান মিথ্যে নয়। সত্যিই আমরা একটা চা-বাগানে এসে হাজির হলুম।

সাহেব আমাদের ঘরে বন্ধ করে রাখবার হুকুম দিয়ে চলে যাচ্ছিল। শেষ চেষ্টা হিসাবে আমি আবার বল্‌লুম, সাহেব, আমাদের বিশ্বাস কর, আমরা সত্যি কোন চা-বাগান থেকে পালাই নি।

চা-বাগানের ম্যানেজার—অখণ্ড তার প্রতাপ। আমাদের মত দু'টো কুলীর, বার বার তাকে বিরক্ত করবার স্পর্দ্ধা দেখে, মুখ তার ক্রোধে লাল হ'য়ে উঠল। তারপর কি ভেবে চলে যেতে যেতে বল্‌লে, বেশ, তোমরা যদি পালিয়ে না এসে থাক, ছাড়া পাবে। রূপ সিং, এখনই সব চা-বাগানে খবর পাঠিয়ে দাও।

অগত্যা চা-বাগানের সাহেবের অতিথি হলুম। রূপ সিং আমাদের একটা ঘরের মধ্যে চাবি বন্ধ করে রেখে চলে গেল।

এখানকার ব্যবস্থা দেখছি, রাজেন বাবুর চেয়ে ভাল! এ যদি মানুষের বাসস্থান হয়, তবে জন্তু-জানোয়ারেরা থাকে কোথায়? ঘরটা যেমন স্যাঁৎসেঁতে—তেমনি দুর্গন্ধময়; জানালার বালাই নেই। উঁচু আড়ার ফাঁকে যেটুকু বাতাস আসে, কুলীদের পক্ষে তা-ই বোধ হয় যথেষ্ট। এই ইন্দ্রপুরীর মধ্যে কতক্ষণ টেঁকব জানি না।

সে রাত্রে কর্তৃপক্ষদের কারও সাক্ষাৎ আর মিল্‌লো না। উপবাসে, দুর্গন্ধময়-অন্ধকার ঘরে দু'জনে পড়ে রইলুম।

ভোর বেলা ঘুম ভাঙ্গতেই আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলুম। সত্যি এখনও বেঁচে আছি! নাঃ, প্রাণটা তা হ'লে এত অল্পে বিদ্রোহ করে না?

একটু বেলা হ'লে রূপ সিং এসে হাজির হ'ল। আমাদের দিলে মাটীর ভাঁড়ে করে চা খেতে। তেষ্টা পেয়েছিল, খেয়ে তৃপ্তি পেলুম। যদিও আগে হ'লে এ চা যে খেতে দিত, তারই গায়ে এই মাটীর ভাঁড় শুদ্ধ ছুঁড়ে মারতুম। এখন আর কোন কিছু সহজে টলাতে পারে না।

রূপ সিং বেরিয়ে যায় দেখে ডাকলুম, সিংজী...

খাতির করে কথা বল্‌তে সিংজী অনিচ্ছা থাকলেও দাঁড়াল। তারপর প্রশ্নমান দৃষ্টিতে তাকালে আমার মুখের দিকে।

দীনতা জানাতে কেমন বাধ বাধ ঠেকে; হঠাৎ মুখ দিয়ে

কথা বেরোয় না। একটা ঢোক গিলে বললুম, সিং-জী, এ ঘরে ত থাকা যায় না ভাই, সাহেবকে বলে আমাদের ছেড়ে দাও না?

আমার স্পর্দ্ধা দেখে, সিং-জীর চোখ দু'টো লাল হ'য়ে উঠল; বললে, খবর না আসা পর্য্যন্ত তোমাদের এইখানে থাকতে হবে। মিছে কেন ঘ্যানর ঘ্যানর কর।

আর বল্‌বারই বা কি থাকতে পারে? নীরবে রূপ সিং-কে চাবি দিয়ে চলে যেতে দেখলুম।

৯

আজ তিনদিন হ'ল চা-বাগানে আছি। সিং-জী আসে—খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করে চলে যায়। কিন্তু কোন খবর এসেছে কিনা প্রশ্ন করলে, সেই এক-ই উত্তর শুনি—না।

রাত্রি তখন কত বল্‌তে পারি না। হঠাৎ কিসের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে দেখি, আলো হাতে একটা ছায়া-মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে। আগাগোড়া কালো আঙরাখা ঢাকা তার দেহ। চমকে উঠে, সমীরকে ডাকতে যাব—মূর্ত্তিটী মুখে আঙ্গুল দিয়ে বললে, চুপ, কোন কথা না।

অসহ্য বিস্ময়ে আমি হতবাক্ হ'য়ে গেলুম। একি! এ এলো কোথা থেকে?

লঘু সন্তর্পিত পদে অগ্রসর হ'য়ে মূর্ত্তিটী আমার সাম্‌নে এসে ফিস্ ফিস্ করে বল্‌লে, কোন কথা বলেছ কি, নিজেদের বিপদ ডেকে এনেছ।

অনন্যোপায় হ'য়ে আমি সমীরের দিকে চাইলুম, দেখি, সেও উঠে বসেছে।

মূর্ত্তিটী ধীর স্বরেই বল্‌লে, তোমাদের সমূহ বিপদ। আজ সকাল হওয়া পর্য্যন্ত যদি তোমরা এখানে থাক, তাহ'লে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর কেউ তোমাদের এখান থেকে উদ্ধার কর্‌তে পারবে না। এখনি পালাও এখান থেকে। বলেই সে হঠাৎ থামল।

আমাদের মনে কিন্তু উঠল—চিন্তার তুফান। সত্যিই কি এ আমাদের বিপদের সম্ভাবনা দেখে উদ্ধার করতে এসেছে, না পরীক্ষা করছে? আমরা কি করব না করব বুঝতে পারলুম না।

আমাদের নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাক্‌তে দেখে, মূর্ত্তিটী পুনরায় ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠল, বিশ্বাস করো আমাকে, এখান থেকে চলে যাও। পথের সন্ধান ত তোমরা জান। এই আলোটা নিয়ে এগিয়ে পড়।

কথা শেষে মূর্ত্তিটী আমাদের কাছ থেকে কেড়ে-নেওয়া ছুরি দু'টো এগিয়ে দিলে।

আর অবিশ্বাস করতে পারলুম না। উঠে পড়ে বল্‌লুম, আমরা যাচ্ছি, কিন্তু বন্ধু, তোমার পরিচয়।

মূর্ত্তিটী জবাব দিলে, চলার পথে ক্ষণিকের পরিচয়—জীবনে কোনদিন আর দেখা হ'বে কি না কে জানে? যদি কোন দিন আবার দেখা হয়, তবে পরিচয় পাবে বৈকি! কিন্তু তোমরা এখনই চলে যাও, আর দেরী করো না। বলেই সে যেমন অকস্মাৎ এসেছিল, তেমনি ভাবেই যেন কথা শেষে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

পথে এসে আমরা দু'জনে প্রাণপণে ছুটতে লাগলুম। লণ্ঠনটা সঙ্গে ছিল, কাজেই বনের পথ খুঁজে নিতে দেরী হ'ল না। এটা যে বন, প্রতিপদেই যে এখানে বিপদ—এ কথা একবারও মনে হয় নি। কে এই অপরিচিত? কেন সে এমন অযাচিত ভাবে মুক্তি দান করলে?—বার বার এই কথাটাই মনের মধ্যে তোলপাড় কর্‌ছিল।

মনে মনে বল্‌লুম, হে ভগবান্, আমাদের মুক্ত করাতে যদি এর কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকে, তবে তুমি তাকে রক্ষা করো।

উষার আলো যখন ফুটে উঠল, আমরা তখন বোধ হয়

চা-বাগান থেকে পাঁচ ক্রোশ পথ দূরে চলে এসেছি। এখন আমাদের ধরা পড়বার আশঙ্কা খুবই কম। একটা গাছের তলায় বসে একটু জিরিয়ে নিলুম। চোখ বুলিয়ে একবার নক্সাখানাও নিলুম দেখে। এবার আমাদের ডিহং নদী পেরিয়ে ওপারে যেতে হ'বে।

আমরা চল্‌লুম, দক্ষিণ দিকে—ডিহং নদীর সন্ধানে।

এতক্ষণে যেন বনটার দিকে চাইবার সময় হ'ল। কি গভীর! চারধারে শুধু শাল, সেগুণ আর শিশুগাছ। এরা যে কতকাল ধরে এই রকম ভাবে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে, তার হিসাব নেই!

জঙ্গলে শুধু যে শাল, সেগুণ গাছ আছে, তা নয়—নানারকম ফলের গাছও রয়েছে। দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলুম। কে এ সব গাছ পুঁতল? এদের ফল ভোগ করেই বা কারা? বনের মধ্যে এই অযত্ন-বর্দ্ধিত গাছগুলো দেখে মনে হ'ল, এ রকম সতেজ গাছ লোকের বাগানেও কখন দেখিনি। তবু ত সেখানে তারা গাছের কত যত্ন করে!

ভগবান্ আমাদের জন্যে যে খাবার সংস্থান ক'রে রেখেছন, তার অনাদর না করে দু'জনে পেট ভরে ফল খেয়ে নিলুম। তারপর চল্‌লুম, ডিহং নদীর সন্ধানে।

বেলা বোধ হয়, দুপুর পেরিয়ে গেছে—আমরা একটা নদীর

ধারে এসে পৌঁছলুম। বুঝতে কষ্ট হ'ল না, এইটেই ডিহং-নদীর শাখা।

মনে একটু আশার সঞ্চার হ'ল। কিন্তু পথ এখনও অনেক···ডিহং পেরিয়ে ওপারে বন। সেই বনের শেষে আমরা পাব শিলচর।

তারপর...তারপর যে করেই হ'ক, বাড়ী পৌঁছাব।

নদীর ধার দিয়ে চলেছি—খেয়া-ঘাটের সন্ধান করতে করতে। এখানে চা-বাগান যখন আছে, তখন নিশ্চয়ই ডাকের ব্যবস্থা আছে।

কোন্ দিকে যে খেয়া-ঘাট—নক্সায় তার কোন সন্ধান মেলে না। কোন্ পথে গেলে যে গন্তব্য স্থানের হদিস্ পাব—তাও জানি না। তবুও নিশ্চেষ্ট হ'য়ে না থেকে, আমরা উত্তর দিকে চল্‌তে সুরু করলুম।

ক্রমে সন্ধ্যা হ'য়ে এল। ক্রমে দূরে গাছের মাথায় সূর্য্যের শেষ আলোর রেখাটিও গেল মিলিয়ে। তবু না পেলুম আমরা খেয়াঘাটের সন্ধান, না মিল্‌লো কোন একটা আশ্রয়স্থান। কাছে বা দূরে একটা বেশ উঁচু গাছও নজরে পড়ল না। ব্যাকুলভাবে আমরা চল্‌লুম—আশ্রয় খুঁজতে খুঁজতে।

রাত এক প্রহর পেরিয়ে গেছে। হঠাৎ একটা বাঘের গর্জ্জন কাণে এল—খুব নিকটেই, সম্ভবতঃ নদীর তীর থেকেই। আর

এই রকম মাটীর উপর চলে বেড়ান নিরাপদ বোধ করলুম না। আশ্রয়ের জন্যে মনটা চঞ্চল হ'য়ে উঠল।

এমন সময় একটা কুকুরের ডাক কাণে আস্‌তেই মনে হ'ল আশার সঞ্চার; উৎসুক হ'য়ে সমীরের মুখের দিকে তাকালুম।

সমীর বল্‌লে, কুকুরের ডাক যখন পাচ্ছি, তখন নিকটেই যে কোন লোকালয় আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সেইখানে দাঁড়িয়ে আমরা গ্রামের সন্ধানে চারদিকে দেখতে লাগলুম। যদি কোন নিশানা বা আলোর রেখা নজরে পড়ে।

নিরাশ আমরা হলুম না। সমীরের অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ লক্ষ্য করে দেখলুম, অদূরে আলোর রেখা। তাড়াতাড়ি চল্‌লুম সেইদিকে।

যে আলো লক্ষ্য করে আমরা এলুম, দেখি—সেটা একখানা পাতার কুঁড়ে। তার মধ্যে বসে, একজন লোক তামাক খাচ্ছে। কাছে এগিয়ে গিয়ে তাকে বল্‌লুম, এখানে রাত্রের মত একটু থাক্‌বার জায়গা পাব?

লোকটা একবার সন্দেহের দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকালে। তারপর বল্‌লে, আচ্ছা, তোমরা বস। কথা শেষে সে বাড়ীর মধ্যে চ'লে গেল।

আশ্বস্ত হ'য়ে মাটির ওপর বসে পড়লুম। বল্‌লুম, সমীর, ভাগ্যে এই বাড়ীর সন্ধান পাওয়া গেল। নইলে আজ বাঘের পেটে আশ্রয় নিতে হ'ত। লোকটাকে ত ভালো মানুষ বলেই মনে হয়, না?

সমীর বল্‌লে, কিন্তু ওর চাউনিটা আমার ভাল বোধ হ'ল না। এখানে আসাটা হয় ত ঠিক হয় নি।

তাকে বাধা দিয়ে বল্‌লুম, বিদেশী লোককে সহজে কি কেউ আশ্রয় দিতে চায়?

কথাবার্ত্তার ফাঁকে দেখি, বনের মধ্যে থেকে সেই লোকটা বেরিয়ে আস্‌ছে—পেছনে তার জন কুড়ি লোক। সেদিকে সমীরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বল্‌লুম, এত লোককে সঙ্গে নিয়ে আসবার হঠাৎ কি কারণ হ'ল বল্ ত? আমরা এমন মাননীয় কেউ নই যে, আদর অভ্যর্থনা করতে হবে।

তারা কাছে এসে পড়েছিল। সমীর তাই আমার কথার কোন জবাব দিলে না।

লোকগুলো এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়াল। এইবার প্রথমে-দেখা লোকটা বল্‌লে, তোরা কোন্ বাগান থেকে পালিয়ে আসছিস্ বল্?

বল্‌লুম, কোন বাগান থেকে আমরা পালিয়ে আসিনি। আমাদের বাড়ী সদিয়া, যাব শিলচরে।

লোকটা হো হো করে হেসে উঠল। বল্‌লে, আমাদের কি ভেবেছিস্ বল্‌ত? কচিখোকা না গাধার মত বোকা? শিলচরে যাবার এই পথ নাকি?

এর উত্তর দিলে সমীর। বল্‌লে, বনের মধ্যে পথ হারিয়ে এখানে এসে পড়েছি।

লোকটা বল্‌লে, বেশ, এসেছিস্ ভালই। আজ ঘরে বন্ধ থাক্। কাল সকালে খোঁজ করে, যে বাগান থেকে পালিয়ে এসেছিস্—সেখানে পাঠিয়ে দোব।

লোকটার কথা শুনে মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। কোন বাগানে কাজ করিনি সত্যি, কিন্তু যে সাহেবটার হাত থেকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছি, আবার যদি তার হাতে গিয়ে পড়ি?

একান্ত অনুনয়ের সুরে বল্‌লুম, কেন মিথ্যে আমাদের আট্‌কে রেখে দেবে, ভাই। সত্যি, আমরা কোথা থেকেও পালাই নি, এটা বিশ্বাস কর।

আমার কথা শুনে দলের মাঝ থেকে একটা লোক বলে উঠল, বেটাদের ত নদী পার হ'তে হ'বে সর্দ্দার। আমি বলি, ওদের ছেড়েই দাও। বরং…একটা অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করে লোকটা আর কথটা শেষ করলে না।

সর্দ্দার বল্‌লে, বেশ, সেই ভালো। তারপর তারই

ইঙ্গিতে একটা লোক এগিয়ে এসে সমীরের পকেট হাতড়াতে লাগল।

তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে কষ্ট হ'ল না। আমাদের সঙ্গে যদি কোন টাকাকড়ি থাকে, তবে সেগুলো কেড়ে নিয়ে ওরা আমাদের ছেড়ে দেবে মতলব করেছে।

মনে মনে হাসি পেল। হায় রে! কাণা কড়িও যে আমাদের পকেটে নেই!

আমাদের দু'জনের পকেট দেখে, লোকটা হতাশ হ'য়ে বল্‌লে, সর্দ্দার, বেটাদের পকেটে কিছু নেই। তারপর বোধ হয় তাকে নিরাশ করবার অপরাধে, ঠাস্ করে আমার গালে এক প্রচণ্ড চড় মেরে বল্‌লে, বেরো বেটারা! দূর হ আমাদের সাম্‌নে থেকে।

অপমান ত বোধ করলুমই না, এমন কি মনে একটু দুঃখও হ'ল না। বরং এত অল্পে ছাড়া পাওয়ায় তৃপ্তি বোধ করলুম। ভেবে আশ্চর্য্য হই—অবস্থা মানুষকে কি না করতে পারে

সেখানে আর না দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে চল্‌তে সুরু করলুম। খানিকটা এগিয়ে এসে বল্‌লুম, সমীর, এবার দৌড়োতে আরম্ভ কর। ওদের নাগালের বাইরে যেতে হবে। যদি ওরা আবার মত বদলায়!

দু'জনে দৌড়োতে আরম্ভ করলুম।

প্রায় ঘণ্টাখানেক দৌড়বার পর আবার কাণে এল বাঘের গর্জ্জন। এতক্ষণ এ সব কথা মনেই আসে নি, কিন্তু এখন বুঝলুম, আর উপেক্ষা করলে চল্‌বে না, কারণ ডাক্‌টা খুব দূর থেকে আসছে বলে মনে হ'ল না।

সমীর আমার আগে আগে দৌড়চ্ছিল। হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ে আমাকে হাত দিয়ে আটকালে।

বল্‌লুম, কিরে, হঠাৎ দাঁড়ালি যে?

সমীর বল্‌লে, চুপ। তারপর সামনের ঝোপের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখালে।

অন্ধকারে বিশেষ কিছু দেখতে পেলুম না। শুধু দু'টো আগুনের ডেলার মত কি জ্বল্ জ্বল্ করছে। বল্‌লুম, ও-দু'টো কি বল ত?

বাঘের চোখ—সমীর বল্‌লে এবং সঙ্গে সঙ্গে হাতের ছুরিখানা সে চোখ দু'টো লক্ষ্য করে ছুড়ে দিলে।

পরক্ষণেই বিকট গর্জ্জনে সমস্ত বন কেঁপে উঠল। বেশ বুঝতে পারলুম, বাঘটা সেইখানে পড়ে গড়াচ্ছে আর মাটীর উপর লেজ আছড়াচ্ছে।

কি অব্যর্থ লক্ষ্য সমীরের! মুগ্ধ-বিস্ময়ে তা-ই দেখতে লাগলুম।

গর্জ্জনের আর বিরাম নেই। ক্রমে আকাশ-বাতাস সেই

বিকট গর্জ্জনে যেন আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল। বনের প্রত্যেকটী গাছের পাতাও যেন কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

অসীম বলশালী সেই জীবের কি প্রচণ্ড, অথচ মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ। যার ভয়ে অরণ্যের সমস্ত প্রাণী তটস্থ, তাকে এই অবস্থায় দেখলে, আনন্দ হয় না—হয় দুঃখ; মনে জাগে মায়া!

সমীর বল্‌লে, তোর ছুরিখানা দেতো তপন, ওর ভব-যন্ত্রণা ঘুচিয়ে দিয়ে, একেবারে ওকে ব্যাঘ্র-লোকে পাঠিয়ে দি।

নীরবে ছুরিখানা তার দিকে এগিয়ে দিলুম।

সমীর আবার সেই রকম তাগ্ করে ছুরিখানা ছুড়ে দিলে। বাস্, যেন কোন্ যাদু-মন্ত্র-বলে অরণ্যের সেই গভীর নিস্তব্ধতা আবার ফিরে এল!

কিন্তু সে কতক্ষণের জন্যেই বা। মৃত্যু পথ-যাত্রী সেই বাঘের আবেদন বোধ হয় বিফল হয় নি। একটু পরেই চারদিক থেকে তার আত্মীয়-স্বজনদের গর্জ্জন আস্‌তে লাগল। বোধ হয়, প্রতিশোধ নেবার জন্যে তারা এগিয়ে আসছে।

তাড়াতাড়ি আমরা সামনে যে গাছ পেলুম, তারই উপর চড়ে বসলুম।

একটু পরেই আমাদের গাছের তলায় পাঁচ, সাতটা বাঘ এসে উপস্থিত। বিকট গর্জ্জনে তারা আমাদের সম্মুখ-যুদ্ধে

আহ্বান করতে লাগল, কিন্তু কাপুরুষ আমরা—সারা রাত্রির ভেতর তাদের সে আহ্বানে কর্ণপাত করি নি।

ভোর হ'লে বাঘগুলো আমাদের দিকে একবার জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে চলে গেল। ঘাম দিয়ে যেন আমাদের জ্বর ছাড়ল।

একটু বেলা হ'লে আমরা অতি সন্তর্পণে গাছ থেকে নামলুম। যে ছুরি দু'টো কাল রাত্রে আমাদের সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিল, সেগুলো তখনও মরা বাঘটার কাছে পড়ে। প্রথমেই আমরা চল্‌লুম—সে দু'টো উদ্ধার করতে।

বাঘের মৃত দেহটা তখনও সেখানে পড়েছিল। সমীরের প্রথম আঘাতে তার চোখের কাছ থেকে চোয়াল পর্য্যন্ত কেটে ঝুল্‌ছে। দ্বিতীয় আঘাতে গলার নলীটা কেমন করে কেটে গেছে।

ছুরি দু'খানা নদীর জলে ধুয়ে নিয়ে আমরা আবার চল্‌লুম, খেয়া-ঘাটের সন্ধানে।

সারাদিন চলেছি। মাঝে শুধু একটা গাছ থেকে গোটা কতক ফল পেড়ে নিয়ে, খাবার জন্যে একটু থেমেছিলুম। বিকেলের দিকে আমরা নদীর ধারে একখানা কুঁড়ে ঘর দেখতে পেলুম।

ঘর-পোড়া গরু যেমন সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায়, তেমনি আতঙ্কিত করে তুলতে লাগল আমাদের—বনের মধ্যে

এই কুঁড়েগুলো। কিন্তু নদীর তীরে একখানা নৌকো বাঁধা থাকতে দেখে, আমাদের ভয় দূর হ'ল। এটা তা হ'লে খেয়া-ঘাটের মাঝির বাড়ী।

একটু পা চালিয়ে কুঁড়েটার কাছে পৌঁছলুম।

কুঁড়ের সামনেই একটা লোক গাছের তলায় বসেছিল। আমরা সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলে, কি চাই?

বল্‌লুম, তুমিই কি খেয়া পার কর? আমরা ও-পারে যেতে চাই।

মাঝি একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, মাথা পিছু চার আনা পড়বে।

সর্ব্বনাশ! চার আনা তো দূরের কথা—চারটে কাণা-কড়িও যে সম্বল নেই!

কথা কইলে সমীর; বল্‌লে, ভাই, সঙ্গে ত কিছুই নেই। যা ছিল, পথে টিক্‌রীরা সব কেড়ে নিয়েছে—খাবার চাল-ডালটি পর্য্যন্ত। আমাদের এখন পার করে দাও। ফেরবার পথে চার আনার দু'গুণ তোমাকে দিয়ে যাব।

মাঝির প্রতিজ্ঞা কিন্তু ভীমের মত অটল। কোন কিছুই তাকে সঙ্কল্প থেকে টলাতে পারল না।

একবার ভাবলুম, বল প্রকাশ করি, কিন্তু মনের ইচ্ছা মনেই

রইল। দেখি, ইতিমধ্যে কোথা থেকে এক পাল মেয়ে-পুরুষ সেখানে এসে জড়ো হয়েছে।

মাঝির বাড়ীর কাছে একটা শিশুগাছের তলায় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লুম। কি করে এ নদী পার হওয়া যায় ভেবে তার কূল-কিনারা পেলুম না।

ক্রমে রাত্রি এল, কিন্তু সন্ধান কিছু মিল্‌ল না। নিরাপদ হবার জন্যে আবার আমরা গাছের ওপর চড়ে বসলুম।

গাছের উপর বসে বসেই ঢুলছি; আবার টাল সামলাতে না পেরে তখনি চম্‌কে জেগে উঠছি। রাত তখন কত বল্‌তে পারি না। কখন যে একফালি চাঁদ আকাশে উঠেছিল তাও জানি না, এখন দেখি, সেটা পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। কিন্তু তাতে রাতের খবর পাব কি করে? চাঁদ তো আর প্রতিদিন ঠিক সময়ে অস্ত যায় না!

কাণে যেন কোথা থেকে একটা ডাক এল, বাবুজী। চম্‌কে চেয়ে দেখি, গাছের নীচে আলো হাতে একজন স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে। বিস্মিত হলুম খুব।

সমীর বল্‌লে, কে?

নীচে থেকে উত্তর এল, একটু আস্তে কথা কইবে, বাবুজী। একবার নেমে এস।

দু'জনে নেমে এলুম। কাছে এসে দেখি, আজই বিকালে

যে স্ত্রীলোকটীকে মাঝির বাড়ীতে দেখেছি, এ সেই। বয়স বছর ত্রিশ, বোধ হয়, মাঝিরই স্ত্রী। বল্‌লুম, কি চাও।

মেয়েটি বল্‌লে, তোমরা নদী পার হ'তে চাইছিলে—আমি তোমাদের পার করে দিতে চাই।

দ্বিধাভরে সমীর বল্‌লে, এই রাতে…এত বড় নদী…

মেয়েটির মুখে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটে উঠল; বল্‌লে, মিছে ভয়, বাবুজী। মাঝির বাড়ী এতদিন মানুষ হলুম, আর নৌকো বাইতে শিখিনি ?

সমীর অগ্রসর হ'ল।

তবু বল্‌লুম, কিন্তু ওরা জান্‌তে পারে যদি ?

মেয়েটি আবার হেসে বল্‌লে, জানতে ওরা পারবে না। আর যদিই বা পারে—পার হ'তে না পেরে তোমরা যে বিপদে পড়েছ, তার চেয়ে বেশী বিপদ আমার হবে না। তোমরা আর দেরী কোর না—ভোর হ'তে আর বাকী নেই।

মেয়েটীর কথায় একটা করুণ আবেদন ফুটে উঠল।

নিঃশব্দে এসে আমরা নৌকার ওপর বসলুম এবং নিঃশব্দেই নৌকা চল্‌তে শুরু করল। বুঝলুম, বড় বড় মাঝিদের মত এই মেয়েটীর নিপুণতা কম নয়—তার কথা বর্ণে বর্ণে সত্যি।

মিনিট দশেক বাদে আমরা পোঁছলুম তীরে। মেয়েটীও নাম্‌ল। কি ব'লে যে তাকে কৃতজ্ঞতা জানাব তা ভেবে

পেলুম না। তা ছাড়া মনে হ'ল, কথার জাল রচনা করে কৃতজ্ঞতা জানাতে গেলে ওকে অপমানই করা হবে বেশী।

মেয়েটী আঁচল থেকে কতকগুলো টাকা নিয়ে সমীরকে বল্‌লে, বাবুজী, ধর।

সমীর হাতটা সরিয়ে নিয়ে বল্‌লে, না, না, তুমি আমাদের ঢের উপকার করেছ, ও থাক্‌।

মেয়েটি আমার দিকে করুণ নয়নে চেয়ে বল্‌লে, বাবুজী, তুমি ধর। আমার কথা না শোন যদি...চোখ হ'তে তার অশ্রু ঝরে পড়ল।

তার সেই চোখের করুণতা আমাকে বিচলিত করে তুল্‌ল। আমি থাকতে পারলুম না, বাধ্য হ'য়ে তার হাত থেকে টাকাগুলো নিলুম। সমীর যে কেন নিতে রাজী হ'ল না—বুঝতে পারলুম না। বল্‌তে গেলে, মেয়েটি আমাদের প্রাণ বাঁচালে। তার সে দয়াটুকু যদি প্রসন্নচিত্তে নিয়ে থাকতে পারি, তবে টাকায় কি দোষ হ'ল ?

হাত বাড়িয়ে টাকা নিয়ে বল্‌লুম, কিন্তু কোথায় এগুলো ফেরৎ...

কাপড়ের আঁচল দিয়া চোখের জল মুছে মেয়েটী ধীরে ধীরে বল্‌লে, বাবুজী, তোমাদেরই মত জোয়ান আমার এক ছেলে ছিল —সে আজ নেই। তোমাদের দেখে, আমার কেমন মায়া হ'ল।

ধরা পড়বার ভয় থাকলেও তোমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্যে মনটা ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল। তোমাদের পার করে দিয়ে—সামান্য এই টাকা কটা দিয়ে, আমি মনে শান্তি পেলুম। তোমাদের বয়সী সকল ছেলের মধ্যেই যে, আমার সেই হারানো ছেলেকে খুঁজে পাই।

মেয়েটি আর কিছু বল্‌তে পারলে না। তার দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

ব্যথাতুর দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়েছিলুম। মনে হচ্ছিল, সব মায়ের মনই এক! ভগবান্‌ কি ঐশ্বর্য্য দিয়েই না এই মাতৃ-হৃদয় গড়েছেন! নইলে সভ্যতার চক্ষে এই বন্য, অসভ্য নারী, হৃদয়ের দিক দিয়ে ত জগতের কোন সুসভ্য নারী অপেক্ষা উঁচু বই নীচু নয়!

চোখের জল মুছে সে বল্‌লে, বাবুজী, চল্‌লুম, ভোর হ'য়ে এল।

বল্‌বার কি-ই বা আছে? নীরবে দাঁড়িয়ে দেখলুম, তার নৌকোর ওপরের ক্ষীণ আলোটি ধীরে ধীরে রাতের শেষ তারাটির মত দিগন্তে মিলিয়ে গেল।

১০

শেষ রাতটুকু নদীতীরেই কাটল। সকাল হ'তেই আমরা নদী-তীর ছেড়ে ধীরে ধীরে বনের মাঝে অগ্রসর হলুম। একটু-খানি এগিয়েই দেখি, দু'একখানা দোকান। বুঝলুম, নদীর ওপারের লোক এপার থেকে তাদের জিনিষ-পত্র কিনে নিয়ে যায়।

আমরা একটা দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালুম। দোকান-দার জাতিতে বুনো হ'লেও ব্যবসার খাতিরে আর সভ্য লোকের সংস্পর্শে এসে তার হিংস্র স্বভাব ছেড়েচে।

দোকানে অতি প্রয়োজনীয় সামান্য দু'চারটি জিনিষ আছে। বুঝলুম, সভ্যতা তার বাবুয়ানীর সিঁদকাটি এখনও এখানে চালাতে পারে নি।

চা-বাগান ছেড়ে অবধি ভাতের মুখ দেখিনি। দোকানে স্তূপাকার চাল-ডাল দেখে কেমন লোভ হ'তে লাগল। বললুম, সমীর, এখানে আজ দু'টি রেঁধে খেলে হয় না?

সমীরের দেখলুম, আপত্তি নেই। চাল-ডাল কিনে আমরা সেখানে একটু পরিষ্কার জায়গা দেখে, রান্না-খাওয়া সেরে দুপুরের আগেই আবার বনের পথ ধরে চললুম।

মেয়েটির দেওয়া সেই টাকা থেকে সমীর কিছু চাল-ডাল

আর চিঁড়ে কিনে নিলে আর আমার কথামত গোটা চারেক দেশলাইও নিতে ভুল্‌ল না।

কাপড় জামার যে অবস্থা—তা আর বল্‌বার নয়। চিম্‌টি কাটলেও ময়লা ওঠে, কিন্তু সাবানের সন্ধান কোথাও পেলুম না। এখানে সাবান কেউ চোখে দেখেনি।

এতদিন খালি হাতে পথ চলেছি, এখন সামান্য একটা বোঝা ঘাড়ে চাপল। বল্‌লুম, সমীর, চাল যদি নিলি, হাঁড়ি না নিলে চল্‌বে কেন?

সমীর একটু হেসে বল্‌লে, হাঁড়ি সঙ্গে নিয়ে যাওয়া সোজা হবে না। হাঁড়ির জন্যে ভাত রাঁধা আটকাবে না—সে ব্যবস্থার ভার আমার ওপর রইল।

হেঁয়ালি না বুঝতে পারলেও সমীরের কথার ওপর নির্ভর করে চুপ ক'রে চল্‌লুম।

পথের কথা বিশেষ ক'রে বল্‌বার কিছু নেই। তবে বন পথের মন ভুলানো দৃশ্যের পর দৃশ্য মনটাকে সব সময় প্রফুল্ল করে রাখে। সে আনন্দ শুধু অনুভব করা যায়। ভাষার সাধ্য নেই—তার যথার্থ রূপ বর্ণনা করতে পারে।

চল্‌তে চল্‌তে আসে গোধূলি—ধীরে ধীরে নামে সন্ধ্যার তরল অন্ধকার। ক্রমে গাঢ় অন্ধকারে চারিদিক ছেয়ে আসে। তারই মাঝে আমরা একটা মাচার কাছে এসে পৌঁছলুম।

মাচাটা দেখে সমীর খুসী হ'য়ে বলে, বাস্, তপন, আজ আর আমরা এগোব না—রাতের মত এত মাচায় আশ্রয় নোব। আমি জান্তুম, মাচা আমরা এখানে পাবই, তাই সন্ধ্যের অন্ধকারেও পথ চলেছি। নইলে সন্ধ্যের পর এ বন অতি ভয়ঙ্কর স্থান। যে বনটা পেরিয়ে এলুম, ওটার সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জান্তুম না বটে। তবে এ বনের কথা আমি কিছু কিছু পড়েছি।

এই মাচার সন্ধানে সমীর পথ চল্‌ছিল শুনে আশ্চর্য্য হলুম। বল্‌লুম, এ রকম উঁচু মাচা যে বনের মধ্যে থাকবে, তা তুই আগে থেকে কেমন করে জান্‌লি ?

সমীর বল্‌লে, এ-গুলোকে হাতী ধরা মাচা বলে। এই বনের মধ্যে এ রকম মাচা অনেক আছে। বন্য জন্তুর হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে হ'লে এর তলায় আগুন জ্বেলে আমাদের ওপরে বসে রাত কাটাতে হবে।

আশে-পাশে যে শুকনো ডাল-পালা পেলুম, তাতেই আগুন জ্বালিয়ে আমরা মাচার ওপর উঠে বসলুম। সে রাত্রে দু'টি শুকনো চিঁড়ে চিবিয়ে আমাদের থাকতে হ'ল। তৃষ্ণার জল —তাও একটু পেলুম না।

আজ এই প্রথম উন্মুক্ত আকাশ-তলে মাচার ওপর শয়ন। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে জোনাকি-পোকার মত মিট্‌মিটে

তারা দেখা যাচ্ছে। বললুম, সমীর এ বনটা কি গভীর দেখেছিস্ ?

সমীর বল্‌লে, হ্যাঁ। আর এখানে কোন ফলের গাছও নেই। আছে—হাতী আর বাঘ; তবে দু'একটা গণ্ডারেরও দেখা পেলেও পেতে পারিস্।

এ বনটা কত বড় ?

খুবই বড় বৈকি ! এ বন পার হ'য়ে শিলচরে পৌঁছোতে আমাদের দিন দশ লাগতে পারে—অবশ্য পথে যদি কোন বাধা না পাই।

মোটে দশ দিন ! মনটা আনন্দে ভরে উঠল।

রাত্রি প্রথম প্রহর বোধ হয় তখন শেষ হয়েছে—বনের মধ্যে সমবেত কণ্ঠের বিচিত্র গর্জ্জন জেগে উঠল। উঃ ! কি বিকট চীৎকার ! ও-বনে একটা বাঘের ডাক শুনেছিলুম—এখানে কতগুলো যে এক সঙ্গে ডাকছে, তা বলতে পারি না। শুধু বাঘ নয়—তার সঙ্গে অন্য পশুও সুর দিচ্ছে। এ ঐক্যতান শুনলে মানুষের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়।

এক একবার গর্জ্জন শুনি, আর পেটের পীলে পর্য্যন্ত যেন চম্‌কে উঠে। প্রতি মুহূর্ত্তেই ভয় হয়—বুঝি বা এখনি ঘাড়ে এসে পড়বে।

এই মিলিত রাগিণীর আলাপনের মধ্যে ঘুম ত দেশ ছেড়ে

পালাল। মাথা হ'য়ে উঠল গরম। যেন পাগলের মত হ'য়ে উঠলুম। এক একটা গর্জ্জন শুনি, আর মনে হয়, মাচা থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুটে পালাই। তাহ'লেই বোধ হয় নিরাপদ হবো।

ক্রমশঃ শব্দ থেমে এল। অবশেষে আমাদের এই দুঃস্বপ্নের পরিসমাপ্তি করলে—প্রভাত এসে। ঠাণ্ডা বাতাস মাথায় লাগতে আমিও যেন কতকটা প্রকৃতিস্থ হলুম।

সকাল বেলা নেমে আবার চল্‌তে সুরু করলুম। কিছুক্ষণ চলার পর বল্‌লুম, সমীর, জলের একটু সন্ধান করতে হবে ভাই। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।

সমীর বল্‌লে, তেষ্টা কি আমারও পায় নি? তবে জলের কোন সন্ধান পাব বলে মনে হচ্ছে না। এ বনে বোধ হয় জল মিলবে না। আর ডিহং নদী থেকেও আমরা অনেক—অনেক দূরে এসে পড়েছি।

বললুম, তাহ'লে এখন উপায়?

উপায় একটা হবেই—সমীর বল্‌লে। কিন্তু তার মুখ দেখে মনে হ'ল, সে নিজেও কথাটা অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করতে পারছে না।

দু'পাশে সজাগ দৃষ্টি রেখে চলেছি, কিন্তু বৃথাই।

মুখের মধ্যে কেমন আঠা আঠা হ'য়ে গেছে—কথা বলতেও কষ্ট হয়। হতাশ হ'য়ে বল্‌লুম, সমীর, আর ত পারছি না

ভাই, আমি এইখানেই বস্‌লুম। এটা মরুভূমি নয়—তবুও দেখছি, জলের অভাবে এখানে প্রাণটা বেরিয়ে যাবে।

সমীরও তৃষ্ণায় কম কাতর হয়নি, তবু আশ্চর্য্য তার মনের বল! আমার পাশে বসে সে বল্‌লে, হতাশ হস্‌নি ভাই, ভগবানের ইচ্ছায়, এ বিপদ থেকে উদ্ধারের পথ একটা পাবই।

চলার শক্তি আমার মোটেই ছিল না। আমি সেইখানেই বসে পড়লুম। তারপর যখন বসার ক্ষমতাও হারালুম, তখন পড়লুম শুয়ে।

সমীর পাশে বসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল, হঠাৎ কোন কথা না বলে, উঠে একদিকে চলে গেল।

সে যে কেন উঠল, আর কোথায় গেল—মাথা তুলে সেটুকু দেখবার ক্ষমতাও আমার ছিল না। নির্জীবের মত তেমনি ভাবেই আমি সেখানে পড়ে রইলুম।

একটু পরেই সমীর চার পাঁচটা বাঁশের কোঁড়ার মত কি হাতে করে নিয়ে এসে বললে, ওঠ তপন, জল খা।

ধীরে ধীরে উঠে বস্‌লুম। বল্‌লুম, কই জল?

তারই একটা সরু মুখ একটু কেটে সমীর আমার হাতে দিলে। দেখলুম, তার মধ্যে টল্ টল্ করছে পরিষ্কার জল। এক চুমুকে সেটা খেয়ে ফেল্‌লুম। সামান্য একটু কষা হ'লেও এ জল পানের অযোগ্য নয়।

সমীরের আনা সেই পাঁচ-পাঁচটা কোঁড়ারই জল খেয়ে দেহের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেলুম। জিজ্ঞাসা করলুম, সমীর, এ-গুলো কি? পেলি কোথায়?

সমীর বল্‌লে, এ-গুলো এক রকম গাছ—জলে ভর্ত্তি থাকে। এই বনেই পেলুম। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে গেলেও আমি কিন্তু একটুও হতাশ হইনি—মনের মধ্যে কেমন একটা বিশ্বাস ছিল, এ বিপদ থেকে উদ্ধার আমরা পাবই। তারপর তোর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে হঠাৎ ঐ গাছগুলোর দিকে দৃষ্টি পড়ল। তখনই মনে হ'ল, জলে ভরা ঐরকম গাছের কথা যেন পড়েছি। পরীক্ষা করতে ছুটে গিয়ে দেখি, সত্যিই তাই। ভগবানকে ধন্যবাদ তপন, আমরা এ যাত্রা জলের অভাবের হাত থেকে রক্ষা পেলুম।

যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লুম, সমীর, তবে ঐ রকম গাছ কিছু তুলে সঙ্গে নেওয়া যাক।

আমার কথা শুনে সমীর হেসে উঠে বল্‌লে, তার আর দরকার হবে না। এই বনের সমস্ত জায়গায় ঐ গাছ বেঙের ছাতার মত গজিয়ে আছে। একবার যখন জান্‌তে পেরেছি, তখন পাওয়া কঠিন হবে না। চল, আর মিছে দেরী করে লাভ নেই। একেই ত অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেল।

দুপুরে এক জায়গায় বসে দুটি চিঁড়ে চিবিয়ে নিলুম; তারপর

আবার সুরু করলুম চল্‌তে। আমাদের জীবনে যেন এখন প্রধান উদ্দেশ্য দাঁড়িয়েছে পথ চলা। জানি না, এর পরিসমাপ্তি হবে কবে!

বিকালে আমরা আবার একটা হাতী-ধরা মাচার কাছে এলুম। সমীর বল্‌লে, আজকের মত এইখানেই আমাদের পথ চলা শেষ।

বল্‌লুম, এখনও বেলা অনেকটা রয়েছে—আমরা আরও খানিকটা পথ এগিয়ে যেতে পারি…

বাধা দিয়ে সমীর বল্‌লে, পারি তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু দিনের বেলা বনটাকে শান্ত-শিষ্ট দেখে, রাতের কথাটা ভুল্‌লে চল্‌বে না। এই মাচার মত নিরাপদ স্থান বনে আর কোথাও পাবি না।

সমীরের কথাটা মোটেই মিথ্যে নয়। তাই তাড়াতাড়ি মাচার নীচে কিছু শুক্‌নো কাঠ জড়ো করতে লেগে গেলুম। এখনও দিনের আলো রয়েছে, তাই ঠিক হ'ল, রাত্রি হ'লে একবার নেমে কাঠে আগুন দিয়ে যাব।

কতকগুলো জল-ভর্ত্তি কোঁড়া কেটে নিয়ে মাচার ওপর উঠলুম।

রাত্রে আবার সেই নিস্তব্ধ বন সচকিত করে আরম্ভ হ'ল পশুদের দাপাদাপি। আর এ ব্যাপার আমাকে তত চঞ্চল

করতে পারলে না। এমন কি—রাত্রে আমি এরই মধ্যে একটু ঘুমিয়ে নিলুম।

সকালে উঠে বল্‌লুম, সমীর, আজ দু'টি ভাত রাঁধ ভাই।

সমীর বল্‌লে, কিন্তু তাতে মিথ্যে সময় নষ্ট হবে। আমরা দিনে যতটা করে এসেছি, ভাত রাঁধার হাঙ্গাম করলে, তার তিন ভাগের এক ভাগও যেতে পারব না। আর দু'টো দিন বরং এই রকম একটু কষ্ট করে কাটিয়ে দে।

কিন্তু এই রকমভাবে চিঁড়ে চিবিয়ে আর থাকা না গেলেও সমীরের যুক্তি অস্বীকার করতে পারলুম না। চিঁড়ে চিবিয়েই পথ চলা চল্‌তে লাগল।

রাত্রে হাতী-ধরা মাচায় বিশ্রাম, বাঘ, হাতীর চীৎকার, আর সারাদিন পথ চলা—এই রকমভাবে আমাদের দিন কাটতে লাগল।

সেদিন সকালে সমীর বল্‌লে, তপন, তুই আমার ওপর রেগে গেছিস্ ভাই? কিন্তু দেখ, আমরা কতটা এগিয়ে এসেছি। মনে হচ্ছে, আর তিন চার দিনের মধ্যে আমরা বন পার হতে পারব।

সমীরের কথা শুনে আনন্দিত যত না হলুম, বিস্মিত হলুম তার চেয়ে ঢের বেশী। বল্‌লুম, রাগ কেন করব সমীর? তার কোন কারণ ঘটেছে বলে ত মনে হয় না?
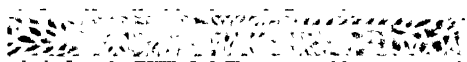
এই সাধ্য থাকতেও তোকে খাবার কষ্ট দেবার জন্যে—সমীর বল্‌লে।

বল্‌লুম, কিন্তু কষ্ট ত আমি একা পাইনি? সঙ্গে সঙ্গে তুইও তো ভোগ করেছিস্। সত্যি, ছোট-খাট সুখ-দুঃখে বিচলিত হ'য়ে আমাদের আসল উদ্দেশ্যটা ভোলা কোন রকমেই চল্‌তে পারে না।

সমীর বল্‌লে, আজ আমরা ভাত রেঁধে খাব। চিঁড়ে যা আছে, তাতে আর দু'একদিন মাত্র চল্‌বে। সেটা বিশেষ দরকারের জন্যে রেখে, আজ যখন সুবিধা রয়েছে, তখন দু'টি ভাতই রাঁধা যাক্। তুই কি বলিস?

সমীরের যুক্তিটা সমীচীন বলে মনে হ'ল। দু'পুর বেলা আমরা একটা হাতী-ধরা মাচার কাছে এলুম। রেঁধে খাওয়ার পক্ষে জায়গাটা উপযুক্ত মনে হওয়ায়, একটু পরিষ্কার জায়গা দেখে উনুন খোঁড়া হ'ল।

সমীর আমার সঙ্গে কাঠ কাট্‌তে আস্‌ছিল। তাকে বাধা দিয়ে বল্‌লুম, তুই আসল জিনিষ হাঁড়ির যোগাড় কর দেখি; কাঠ, জল এ সব যোগাড় করবার ভার রইল আমার ওপর। তোকে সে বিষয়ে ভাবতে হবে না।

কাঠ কেটে জল-ভরা কোঁড়া যোগাড় করে যখন সমীর হাঁড়ির কি করলে জান্‌তে এলুম, দেখি, কাঁচা শাল পাতা

দিয়ে সমীর এক ঠোঙ্গা তৈরী করেছে। আর তার তলায় মাটি দিয়েছে লেপে।

দেখে হতাশ হ'য়ে বল্লুম, এই দিয়ে তুই ভাত রাঁধবি সমীর? তোর কি মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে?

সমীর বল্লে, হ'তে পারে, কিন্তু তোর সব যোগাড় ত? বেশ, তাহ'লে একেবারে হাতে-কলমে পরীক্ষাই দোব। খুসী হ'য়ে তুই যে আমাকে পূরো নম্বর দিবি, তাতে আমার একটুও সন্দেহ নেই।

নম্বর যে পুরাপুরি শূন্য পাবে, তাতে সন্দেহ ছিল না তবুও কথা বাড়বার ভয়ে চুপ করে গেলুম।

সমীর সেই ঠোঙ্গায় জল দিয়ে আগুন জ্বেলে উনুনে চাপিয়ে দিলে; একটু বাদে তাতে চাল-ডাল, আলুও দিলে ফেলে।

নিরুৎসাহ ভরে আমি দূরে বসে সমীরের এই ছেলেখেলা দেখতে লাগলুম।

মিনিট দশেক কেটে গেলেও যখন দেখলুম, সমীর নিশ্চিন্ত মনে একটা কাঠি দিয়ে ভাত নাড়ছে, তখন আর দূরে বসে থাকতে পারলুম না। ব্যাপারটা কি দেখবার জন্য উঠে তার কাছেই এসে বসলুম।

বল্লুম, কিরে? কি হ'ল?

নির্ব্বিকারভাবে সমীর বল্লে, ছাখ্না, ভাত ফুটছে।

সত্যিই দেখি তাই। শালপাতাটা অবিকৃতই রয়েছে, পোড়েও নি, বা তা দিয়া এক ফোঁটা জলও পড়ে নি।

যথাসময়ে ভাত রান্না হ'য়ে গেল। সেই চাল-ডাল সিদ্ধ, আলু ভাতে আর নুন—এতদিন পরে কত ভাল যে লাগল, তা আর কি বল্‌ব ?

এক অত্যন্ত গরীব স্ত্রীলোক একদিন মোহন ভোগ খেয়ে নাকি আনন্দে বলেছিল, কি চমৎকার জিনিষ! বড় লোকের মোহন ভোগ, গরীবের রাজ ভোগ—আমাদের অবস্থাও আজ তার থেকে একটুও ভিন্ন নয়।

অন্নরসের কেমন একটা মাদকতা শক্তি আছে। পেটে পড়লেই শরীরে কোথা থেকে রাজ্যের আলস্য এনে দেয়। তারপর এতদিন পরে খাওয়ার দরুণ আমাদের আর নড়বার শক্তি রইল না। ঠিক করলুম, মাচার ওপর একটু বিশ্রাম করে আবার পথ চল্‌তে সুরু করব।

ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। যখন জাগলুম, বেলা অনেক হ'য়ে গেছে। বল্‌লুম, আজ আর এগিয়ে কাজ নেই, এখানেই রাতটা কাটান যাক্।

সমীর কিন্তু রাজী হ'ল না। তার বিশ্বাস, ঘুম থেকে উঠে ঠিক বেলা বুঝতে পারছি না। বিকাল হ'তে এখনও অনেক দেরী।

হবেও বা! গভীর ঘুমের পর অনেক সময় বিকালকে সকাল বলে ভুল হয় শুনেছি, তাই আর কোন তর্ক না করে সমীরের সঙ্গ নিলুম।

সন্ধ্যা যখন হ'ল, তখন পেছনকার মাচাটা ছাড়িয়ে অনেক দূর এসে পড়লেও সামনে যতদূর দৃষ্টি যায়—কোন মাচা চোখে পড়ল না। মনে মনে প্রমাদ গণলুম।

জোরে জোরে পা চালিয়ে আরও কিছুদূর এলুম বটে, কিন্তু তাতে ফল বিশেষ কিছু হ'ল না। এদিকে রাত্রি হ'য়ে গেছে। সামনে এগোতে বা পেছনের মাচায় ফিরে যেতে আর সাহস হচ্ছিল না।

নিকটেই ছিল এক প্রকাণ্ড শিশু গাছ। সেইটে দেখিয়ে সমীর বল্‌লে, এর ওপরে চড়ে রাত কাটানো ছাড়া আর ত অন্য কোন উপায় দেখি না, তপন। তোর কথা তখন না শুনে কি অন্যায়ই যে করেছি!

১১

ম্লান জ্যোৎস্নায় বন ভরে গেছে—বোধ হয়, এইবার পূর্ণিমা আস্‌ছে। বল্‌লুম, এখন দুঃখ করা মিথ্যে, সমীর, আয়, বরং তাড়াতাড়ি গাছে উঠে, বসবার একটা ভালো দেখে জায়গা ঠিক করে নি।

গাছের ওপরে দু'টো ডালের মাঝখানে তিন চারটে ডাল ফেলে একটা তক্তার মত করলুম। তারপর দিলুম—তার ওপর পাতা বিছিয়ে। বেশ ভালো করে বসা ত চলবেই, এমন কি পালা করে এক একজনের একটু করে ঘুমিয়ে নেওয়া পর্য্যন্ত চলতে পারে। অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না।

রাত্রি ক্রমশঃ গভীর হচ্ছে। দেখি, গাছের তলা দিয়ে একদল হরিণ ছুটেছে—তাদের পেছন পেছন তাড়া করে চলেছে —একটা বুনো শূয়োর। এই বুনো শূয়োরই শুনেছি, বন্য জন্তুদের মধ্যে সব চেয়ে সাহসী আর হিংস্র।

কাছে এবং দূরে চারধার থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে —বিচিত্র স্বর। তাদের সবগুলোর সঙ্গে আমরা ভালরকম পরিচিতও নই।

এই সব দেখতে এবং শুন্‌তে শুন্‌তে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম, হঠাৎ চমক্ ভাঙ্গতেই দেখি, এক পাল হাতী আসছে

আমাদের গাছের দিকে। অত্যন্ত ধীরে—যেন চলার তাড়া তাদের মোটেই নেই।

হঠাৎ কাণে একটা হিস্ হিস্ শব্দ এল। গাছের মাথার দিকে তাকিয়ে যা দেখলুম, তাতে মুখ দিয়ে আর কথা বেরোল না। ইসারায় সমীরকে তা দেখালুম।

গাছের ওপর ডালে একটা প্রকাণ্ড অজগর সাপ পাক খেয়ে জড়িয়ে আছে, আর ফণা উঁচু করে আমাদের ছোবল দেবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। সাপটা দেখি, গাছের ডাল থেকে এক এক পাক নিজের দেহটাকে খুলে নিয়ে আমাদের নাগাল ধরতে চেষ্টা করছে। কি সর্ব্বনাশ! ওধারে হাতীর পাল এতক্ষণে প্রায় গাছের তলায় এসে গেছে। কোথায় যাই?

সাপটা দেখি, ডাল থেকে আর এক পাক নিজের দেহটা মুক্ত করছে; আর কোনও উপায় নেই—আমাদের বাঁচবার। এই বারেই আমাদের নাগাল সে পাবে।

সাপটাকে ফণা তুলে এগোতে দেখেই ভয়ে চোখ বুজোলুম।

ধপ্ করে একটা শব্দ হ'তেই চোখ খুলে দেখি, সমীরের হাতের ছুরিখানা নীচে পড়ে যাচ্ছে। আর সাপটার আধখানা দেহ নীচেকার এক ডালে আট্‌কে পড়ে ঝুলছে। ভাবলুম, যাক্, এ যাত্রা তাহ'লে রক্ষে পেলুম।

কিন্তু এত সহজে যদি নিষ্কৃতি পাব, তা হ'লে এ বনে আসবই বা কেন? সমীরের ছুরিখানা একটা হাতীর গায়ে গিয়ে পড়তেই সে গর্জ্জন করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দলটা থেমে শুঁড়গুলো আকাশের দিকে তুলে, বাতাসে বোধ হয় শত্রুর গন্ধ শুঁকে নিলে। তার পরেই একটা হাতী আরম্ভ করলে ডাল ধরে টানাটানি। তার ইচ্ছে, সমূলে গাছটা উপড়ে, শত্রুদের পায়ের তলায় পিষে মেরে ফেলবে। তার প্রচণ্ড আকর্ষণে ডালগুলো মড়্মড়্ করে ভেঙ্গে পড়তে লাগল—গাছটা লাগল দুল্‌তে। প্রাণপণে ডাল আঁকড়ে ধরে পতনের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে লাগলুম।

উঃ! কি ভীষণ এদের হিংসা-প্রবৃত্তি! বুঝলুম, সাপের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে থাকলেও এদের হাতে মৃত্যু সুনিশ্চিত।

কিন্তু একি! হাতীগুলো হঠাৎ আমাদের ছেড়ে দিয়ে প্রাণপণে দৌড় দিলে। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক প্রচণ্ড ধাক্কায় আমাদের গাছটা কাঁপিয়ে, তাদের তাড়া ক'রে ছুটে গেল একটা গণ্ডার।

বড় আশায় গাছের উপর শয্যা রচনা করেছিলুম, কিন্তু শুতে আর হ'ল না। দারুণ আতঙ্কে দু'জনে সজাগ হ'য়ে বসে রইলুম—রাত্রিশেষে দিনের আলো তার বরাভয় মূর্ত্তি নিয়ে হাজির না হওয়া পর্য্যন্ত।

প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে রাতের বিভীষিকা দূর হ'ল। গাছ থেকে নেমে আবার আমরা চল্‌তে সুরু করলুম।

কাল রাতের ঐ কাণ্ডের পর আজ আর ভাত খাওয়ার কথা মনে স্থান দিলুম না, চিঁড়ে চিবিয়েই চল্‌তে লাগলুম। দু'দিন উপোস করতে হয় তাতেও রাজি, কিন্তু এ বন থেকে যত শীগ্‌গির বেরোতে পারি, ততই মঙ্গল।

হাতী-ধরা মাচা পেতে আজ আর বিশেষ কষ্ট হয় নি। সন্ধ্যার মুখে তার ওপর উঠে বস্‌লুম।

আজ বোধ হয় পূর্ণিমা। সমস্ত পৃথিবী আজ চাঁদের কিরণে যেন হাস্‌ছে।

ঘুমোতে আর সাহস হয় না। দিনের আলোয় যে বিভীষিকা অন্তর্হিত হ'য়ে গিয়েছিল, রাতের অন্ধকারে তা-ই দেখি, মনের কোণে উঁকি মারছে। জ্যোৎস্না-স্নাত বনভূমির দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দু'জনে তাকিয়ে রইলুম।

সেই জ্যোৎস্নার আলোতে দেখি, গোটা কতক হরিণ ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে; কি সুন্দর ওদের দেখতে! মাঝে মাঝে কি চমৎকার ভঙ্গীতেই না ওরা কাণ পেতে দাঁড়াচ্ছে! বোধ হয়, শত্রুর পদশব্দ শুনতে চেষ্টা করছে। হঠাৎ দেখি, কোথা হ'তে একটা বাঘ তাদের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। ভয়ে হরিণগুলো ছত্রভঙ্গ হ'য়ে যে যেদিকে পারলে পালাল, শুধু

একটা—বাঘের কঠিন থাবার আঘাত খেয়ে আর পালাতে পার্‌লে না।

তার সে কি করুণ চীৎকার!

একধারে সেই দুর্ব্বল-প্রাণ হরিণের প্রাণ-ভয়ে আর্ত্ত-চীৎকার, আর একধারে অরণ্যের সবলতম ব্যাঘ্রের নৃশংস কাণ্ড! মনটাকে মুহূর্ত্তে বিষিয়ে তুল্‌লে।

দুর্ব্বলের এই নিষ্ফল চীৎকার বন্ধ ক'রে দিলে, ব্যাঘ্রবর তার পেট চিরে দিয়ে। তার পর সবেমাত্র সে সেই টাট্‌কা রক্ত আস্বাদ করবে—এমন সময় কোথা থেকে ধূমকেতুর মত এসে হাজির হ'ল এক হাতী। তার ভাব—যুদ্ধং দেহি।

ব্যাঘ্রবরও সহজে হটবার পাত্র নয়; দু'জনে আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ চল্‌ল।

আরম্ভ হ'ল অরণ্যের দু'টি বলিষ্ঠ-প্রাণীর দ্বন্দ্ব। জীবন-যাত্রার পথে তাদের কোন স্বার্থ না থাক্‌লেও যুদ্ধ করতে তাদের কোন আলস্য নেই।

একজন নিরামিষাশী—গাছ-পাতা, ফল-মূল খায়; আর একজন মাংসাশী—খায় মাংস।

কী ঘোরতর যুদ্ধই না আরম্ভ হ'ল। শারীরিক শক্তিতে কম বোধ হয় কেউ-ই নয়; তবুও ব্যাঘ্রের সুবিধা বেশী। সুবিধা তার হাতীর তুলনায় ক্ষুদ্র দেহ—তার শত্রুকে আক্রমণ

করবার কৌশল। একবার দেখি, হাতীটা শুঁড়ে করে বাঘকে জাপটে ধরে মারে এক আছাড়। মনে হয়, বাঘের লীলা-খেলা বোধ হয় শেষ হ'ল। কিন্তু পরক্ষণেই দেখি, বাঘটা হাতীর ঘাড় ধরেছে কামড়ে, কিছুতেই সে নিজেকে মুক্ত করতে পারছে না। ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে তার কাঁধ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

এই রকম ভাবে তাদের যুদ্ধ চল্‌ল। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে হিংস্র কণ্ঠের গর্জ্জন পর্দ্দার পর পর্দ্দায় চড়তে লাগল। ভয়ে—বিস্ময়ে আমাদের সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হ'য়ে উঠল। কম্পিত বক্ষে আমরা জয়-পরাজয় লক্ষ্য করতে লাগলুম।

অবশেষে হাতীরই হ'ল জয়। আছাড়ের পর আছাড় মেরে বাঘকে শেষ করে—ক্লান্তিতে সে সেইখানেই কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে পড়ে গেল।

যুদ্ধের ফলাফল দেখে মনে দুঃখ হ'ল। হায় রে! হরিণটাকে মেরে বাঘটা খেতে যাচ্ছিল। বেচারা তখন ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে পারেনি, এ জগতে তার খাওয়ার প্রয়োজন মিটে গেছে।

পরদিন আবার চলেছি। বেশ বুঝতে পারছি—আমাদের চলার শেষ হ'য়ে আসছে। বন হ'য়ে আসছে ক্রমশঃ পাতলা। পায়ে চলা পথ আমরা অনেক দেখতে পাচ্ছি। অবশেষে আমরা
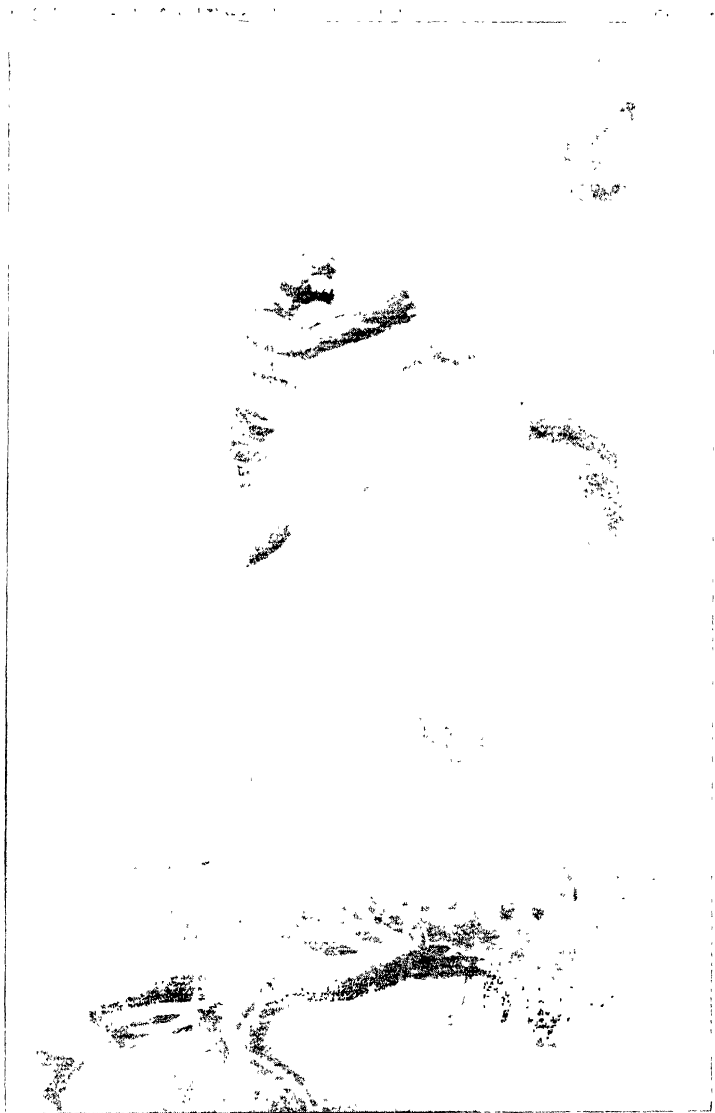
একবার দেখি, হাতীটা শুঁড়ে করে বাঘকে জাপটে ধরে

বনের বাইরে এসে পৌঁছলুম—এক পাকা রাস্তার ওপরে। সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল, বেলা দুপুর পেরিয়ে গেছে।

মনের মধ্যে আনন্দের ঝড় বয়ে গেল। এ আনন্দের শিহরণ যেন এ ক্ষুদ্র দেহ সহ্য করতে পারবে না—বুকের ধুক্‌ধুকুনি বন্ধ হ'য়ে যাবে! বললুম, সমীর, চল্‌, একেবারে লোকালয়ের মধ্যে গিয়ে বিশ্রাম নোব।

সমীরেরও তাই ইচ্ছে। অভিশপ্ত বন থেকে যখন একবার বেরোতে পেরেছে, তখন এর ত্রি-সীমানায় আর থাকবে না।

মাইল খানেক পথ হেঁটে আমরা সহরের বুকে উপস্থিত হলুম।

এতদিন নির্জ্জন বাসের পর এত লোক-জন, কল-কোলাহল অতি বিচিত্র মনে হ'তে লাগল। বল্‌লুম, সমীর, ভাই, আজই বাড়ী রওনা হ'তে হবে।

সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে নিশ্চিন্ততার মধ্যে এসে এক মিনিটও আর এখানে থাকৃতে ইচ্ছে করছে না। আমার আজন্ম পরিচিত গৃহ, আমার মায়ের স্নেহ যেন হাতছানি দিয়ে আমায় ডাক্‌ছে। তাদের আকর্ষণ কাটিয়ে এখানে বাস করি, সে শক্তি আর মনের নেই।

* *   * *   * *

একদিন যেমন নিঃশব্দে প্রফুল্ল মুখে বাড়ী থেকে বিদায় নিয়েছিলুম, আজও ঠিক সেই রকম ভাবে ফিরে এলুম। সেদিন মায়ের ছল-ছল চোখ যেমন আমাদের সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার পাবার আশায় আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করেছিল, আজও তেমনি আমাদের ভক্তি-নত শিরে মা যে নিঃশব্দ আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করলেন, তা সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করলুম।

আমাদের দেখে, ক্ষণেকের জন্যে মা যেন কেমন উন্মনা হ'য়ে গেলেন। অবশেষে সে ভাবটা সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লেন, তোরা একটু বোস বাবা, আমি চা নিয়ে আসি।

ছ'পুরে খেয়ে দেয়ে ছ'জনে ঘুমোবার চেষ্টা করছি, কিন্তু ঘুম কেমন আস্‌ছে না। বৃথাই চোখ বুজে তার আরধনা করছি।

সমীরের বোধ হয় আমারই মত অবস্থা। ঘুমের সম্বন্ধে নিরাশ হ'য়ে তাকে ডাক্‌তে যাব, এমন সময় হাস্‌তে হাস্‌তে সে বল্‌লে, কিরে, ঘুম হ'ল না ?

বিরক্তি ভরে বল্‌লুম, না। এখানে নিশ্চিন্তে ঘুমোবার উপায় থাক্‌লেও ঘুমের দেখা নেই—অথচ বনে কি ঘুমটাই না পেত।

সমীর দেখলুম কেমন অন্যমনস্ক হ'য়ে গেছে। আমার

কথা বোধ হয় তার কাণে যায় নি। হঠাৎ সে বলে উঠল, আচ্ছা, তপন, আমাদের পথের নক্সা, ছুরি, চা-বাগানের সাহেবের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া, নদী পেরোন এ—সমস্তের মূলে এক অতি-হিতৈষীর গোপন চেষ্টা প্রকাশ পাচ্ছে। সে কে বল্‌তে পারিস্‌ ?

এ সন্দেহ আমার মনে বরাবরই ছিল, কিন্তু এই লোকটী যে কে, তার মীমাংসা কোন রকমেই করে উঠতে পারি নি। তাই বল্‌লুম, একেবারেই না। আর বোধ হয় এখানে বসে সারা জীবন চেষ্টা করলেও তার সন্ধান পাবি না।

সমীর বল্‌লে, ঠিক তাই। নিজেদের মুক্তির জন্যে আমার আত্মহারা হয়েছিলুম যে, তাঁকে খুঁজে বার করবার, তাঁর পরিচয় জান্‌বার কোন চেষ্টাই করি নি। তার কথার মধ্যে ব্যথার সুর বেজে উঠল।

এর উত্তরই বা কি আছে ? তাই চুপ করে রইলুম।

কিন্তু তখন স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি—এর চেয়ে কত বড় বিস্ময় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে…

মা ঘরে এসে বল্‌লেন, কি রে, ঘুমোস্‌ নি তোরা ?

বল্‌লুম, ঘুম চোখ থেকে অনেক দিনই বিদায় নিয়েছে, মা। তবে তোমার কোলে যখন আবার এসে পড়েছি, তখন ঘুমের দেখা শীগ্‌গিরই পাব তা বুঝতে পারছি।

আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মা বল্‌লেন, তোদের দুর্ভোগের কথা আমি বুঝতে পেরেছি—তারপর হঠাৎ যেন কি মনে পড়ে যাওয়াতে ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লেন, তোরা একটু বোস, আমি এখনি আসছি।

মায়ের কথায় যেন হাসি-কান্না মেশান। দু'জনের কানেই তা বাজ্‌ল। নীরবে আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলুম।

পরমুহূর্ত্তেই মা একখানা চিঠি হাতে নিয়ে ফিরে এলেন।

বল্‌লুম, কার চিঠি মা?

মা বল্‌লেন, তোর। আমি খুলেছিলুম; পড়ে দেখ।

চিঠিখানা আমার কোলের উপর ফেলে দিয়ে মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বেশ স্পষ্ট দেখতে পেলুম, মার চোখে জল।

চিঠিখানা খুলে দু'এক লাইন পড়েই আমার আর বিস্ময়ের সীমা রইল না।

সমীর আমার মুখের দিকে চেয়েছিল, আমার বিস্মিতভাব দেখে বল্‌লে, কার চিঠি রে?

বল্‌লুম, শোন্।

কল্যাণীয়েষু,

তপন, তোমার বংশ পরিচয় জেনে যেমন তোমাকে আমার চিন্‌তে কষ্ট হয় নি, আমাকে প্রথম দর্শনেই যে তুমি চিন্‌তে

পেরেছিলে, তা তোমার বিস্মিত ভাব দেখে বুঝেছিলুম। তোমরা যে অপরাধ করেছিলে, এখানকার নিয়মে তার শাস্তি টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে কেটে পুঁতে ফেলা। আজ পর্য্যন্ত এর কোন ব্যতিক্রম হয় নি। নিজের হাতে কত লোককে এই শাস্তি অম্লান-বদনে দিয়েছি, মনের মধ্যে কোন বৈক্লব্যই হয় নি। কিন্তু তোমাকে চিন্‌তে পেরে, সে শাস্তি দিতে পারলুম না—শাস্তির কথা মনে হ'তেই বুকের রক্ত যেন জমাট বেঁধে গেল। হাত আর উঠল না। মনের কাছে অপরাধী হ'য়ে রইলুম।

যৌবনে একদিন নিজের হাতে এই দল গড়েছিলুম। নিজেই তৈরী করেছিলুম—এর নিয়ম-কানুন। আমাকে কেউ চায়নি, সুতরাং জগতে পেছু ফিরে তাকাবার আমার কোন বালাই ছিল না। মনের কোমল বৃত্তি—স্নেহ, দয়া, মায়াগুলোকে নির্ম্মমভাবে নির্ব্বাসন দিয়ে, কঠোর হস্তে, অপ্রতিহত প্রভাবে, এতদিন শাসন-দণ্ড পরিচালনা করে এসেছি।

নির্ব্বিচারে সকলের উপর চরম দণ্ড প্রয়োগ করেছি, কিন্তু তোমাদের অব্যাহতি দিয়েছি—একথা মনে ক'রে শাস্তি পাচ্ছিলুম না—আমার কৈফিয়ৎ তলব করবার মত সাহস এখানে কারও নেই জেনেও।

তোমরা পালাবার প্রায় সপ্তাহ খানেক পরে শঙ্কর এসে হাজির। বল্‌লে. শাস্তি দিন।

বল্‌লুম, কেন? কি অপরাধে? বল্‌লে, সে তোমাদের পালাবার সাহায্য করেছে। দিয়েছে অস্ত্র—পথের নক্সা। উদ্ধার করেছে চা-বাগানের সাহেবের হাত থেকে; মাঝির স্ত্রীকে দিয়ে নদী পার করিয়ে, তার হাত দিয়ে টাকা পৌঁছে দিয়েছে।

শুনে স্তম্ভিত হলুম; বল্‌লুম, কোথা থেকে এল তোমার এ সাহস!

শঙ্কর কিছুক্ষণ ঘাড় হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বল্‌লে, সেটা আমিই এখনো জান্‌তে পারি নি। কি সাহসে করেছি, তাই ভেবে এখনও আশ্চর্য্য বোধ করি। তবে তাদের দেখে মায়া হয়েছিল—সেই সাহসেই বোধ হয়।

শুনে মনে হ'ল, ঠিক। মায়া-দয়া-স্নেহ-মমতাগুলো মরে যায় না। প্রকাশের উপযুক্ত পথ না পেয়ে যখন তারা নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে থাকে, মূর্খ আমরা, তারা মরে গেছে বলে, তখন আত্মপ্রসাদ লাভ করি।

গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লুম, জান এর শাস্তি তিলে তিলে মৃত্যু?

শঙ্করের মুখে একটুও দুঃখ বা ভয়ের চিহ্ন দেখতে পেলুম না। বল্‌লে, তাই দিন। যদি সেই যন্ত্রণা ভোগ করলে এতদিনের পাপের কোন ক্ষয় হয়। কিন্তু নিজে অপরাধী হ'য়ে অপরের অপরাধের বিচার করব? হার মানতে হ'ল। তার কাছে নিজের অপরাধ খুলে বল্‌লুম। তোমাদের মুক্তি

দিয়েছে বলে, আনন্দে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলুম। বল্‌লুম, মৃত্যুকে আলিঙ্গন ক'রে পাপের ক্ষয় হবে না, শঙ্কর। এই সব ত্যাগ করে প্রতিদিনের দুঃখ-কষ্ট-ভোগ করে পাপের স্মৃতিতে দগ্ধ হ'য়ে এর প্রায়শ্চিত্ত করবার সাহস আছে?

শঙ্কর বল্‌লে, আছে।

বল্‌লুম, তবে প্রস্তুত হও। এই সমস্ত ছেড়ে দিয়ে এক বস্ত্রে নিঃসম্বল হ'য়ে এ জায়গা ছেড়ে যেতে হবে।

শঙ্কর তাতেও অমত করে নি।

তারই সঙ্গে আজ চলেছি এখান ছেড়ে—কোথায় জানি না। অপরাধ করেও এখানকার প্রধান হ'য়ে থাকতে মন আর চাইল না।

তাতে দুঃখ আমার মোটেই নেই। একদিন গৃহত্যাগ করে মাতৃ-সমা বৌদির বুক ভেঙ্গে দিয়েছি। আজ তাঁর এক-মাত্র পুত্র—আমাদের বংশের একমাত্র সন্তানের হত্যার পাপ-ভাগী হ'য়ে তাঁর বুক চূর্ণ করে দিতে এবং আমাদের অতি প্রাচীন বংশ লোপ করবার অভিসম্পাত কুড়োতে পারব না।

আজ থেকে কোন পাপ কাজ আর করব না। তোমাকে আশীর্ব্বাদ করবার অধিকার আমি হারিয়েছি। পার ত আমায় ক্ষমা ক'রো।

তোমার কাকা